মূর্ত্তিময়ী কৃপা মা আনন্দময়ী

বাসন্তী মৈত্র

সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা
সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা
সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা
সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা
সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা

সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা সাহিত্যিকা

মূর্ত্তিময়ী কৃপা মা আনন্দময়ী

মূর্ত্তিময়ী কৃপা মা আনন্দময়ী

বাসন্তী মৈত্র

সাহিত্যিকা
১৬১/২/১ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা- ৭০০০১৯

মূর্ত্তিময়ী কৃপা মা আনন্দময়ী

গ্রন্থস্বত্ব ঃ বাসন্তী মৈত্র

প্রথম প্রকাশ

সরস্বতী পূজা / ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০০

২৬ মাঘ ১৪০৬

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় প্রকাশ

জন্মাষ্টমী ১৪০৯ / ৩০ আগষ্ট ২০০২

লেসার কম্পোজ ও অফসেট মুদ্রণ

সাহিত্যিকা

১৬১/২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

কলকাতা- ৭০০০১৯

মূল্য

ত্রিশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
পোঃ কনখল, হরিদ্বার, উত্তরাঞ্চল
পিন ঃ ২৪৯৪০৮

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম
পোঃ কামারহাটি, আগরপাড়া
কলকাতা-৭০০ ০৫৮

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠ
ভদৈনী, বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ,
পিন ঃ ২২১০০১

সাহিত্যিকা
১৬১/২/১ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৯

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ সম্মিলনী
মা আনন্দময়ী সৎসঙ্গ ভবন
এফ. ই. ৩, সল্টলেক
কলকাতা -৭০০ ০৯১

উৎসর্গ

শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের
ভক্তদের আনন্দদান উদ্দেশ্যে
সশ্রদ্ধ অর্পণ

সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত অজিত নাথ রায়ের লেখিকাকে লিখিত পত্র

কল্যানীয়া বাসন্তী,

কয়েকদিন আগে অখিল তোমার লেখা বই আমাকে দিয়ে গেছে। তোমার লেখা আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব পড়েছি। আমি গত পনের বছরে রামকৃষ্ণ জগতের বই ছাড়া কিছুই পড়ি না। তোমার বই পড়ার প্রথম কারণ আমি মা আনন্দময়ীকে দেখেছিলাম। দ্বিতীয় কারণ তোমার কাছে ওঁর কথা আগে শুনেছি। তোমরা ওঁর কাছে কত যেতে। গুরুসঙ্গ তুমি যেভাবে করেছো সমস্তটা মনের জোরে। তোমার লেখা পড়ে আমার কয়েকটি কথা লিখতে ইচ্ছা হয়েছে।

প্রথম যখন মনের প্রস্তুতি হয় সেই সময় গুরু দর্শন, গুরু লাভ, গুরু কৃপা সব আসে। তোমার ক্ষেত্রে সেটি প্রথম থেকে ফুটে উঠেছে তোমার লেখাতে।

দ্বিতীয় তোমার লেখা প্রত্যেকটি ঘটনা থেকে আমার মনে হয়েছে যে এতটা সত্যের উপর তুমি নিজেকে ধরে রাখতে পেরেছো তোমার বিশেষ গুরুকৃপাতে। গোপালকে পাওয়া আর আনন্দময়ী মার মুখে বাতাসা প্রসাদ করার কথা পড়ে আমার মনে হয়েছে তোমার গুরুকৃপা সব সময় আছে।

তোমার গুরুকৃপা লাভের যেসব বর্ণনা দিয়েছো তাতে আমার মনে হয় তোমার ব্যাকুলতা এত তীব্র যে, তার থেকে তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। তোমার গুরুর প্রতি অনুরাগ তোমাকে আজ পর্যন্ত শরণাগতিতে রেখেছে। তোমার অসুখের সময় যেমন আনন্দময়ী মার দর্শন পেয়েছিলে এখনও তুমি তাই পাচ্ছ সূক্ষ্মভাবে।

আমি তোমার কথা যখনই অখিল আসে জিজ্ঞাসা করি। তুমি ভাল থাক এই বিশেষ প্রার্থনা করি। তোমাকে তোমার গুরু কৃপায় কৃতার্থ করে রেখেছে আমার ধারণা।

আমি বড় একটা চিঠি লিখি না। এটার আরো একটা কারণ বলে শেষ করি। আমার শিক্ষক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী আমাদের Post graduate class -এ পড়াতেন। আমাকে স্নেহ করতেন। ১৯৭৩/১৯৭৪ সালে দিল্লীতে দুর্গাপূজার সময় আমাদের দু'জনকে আনন্দময়ী মার কাছে নিয়ে যান। আমরা তাঁর পাদস্পর্শ করি। তিনি আমাদের ফল হাতে দিয়ে আশীর্বাদ করেন। তিনি ত্রিপুরারীবাবু সব সময় আমাদের নিয়ে ছিলেন। তুমি আর অখিল আমার স্নেহাশীষ জেনো। ইতি —

অজিত নাথ রায়

আমার কথা

কৃপাসিন্ধু অনাদি অনন্ত কৃপাময়ী করুণাময়ী, শ্রীশ্রী আনন্দময়ী মায়ের সম্বন্ধে কিছু লেখা খুবই কঠিন। ভাষা তাঁর কাছে ভেসে বেড়ায়। বিদগ্ধ পণ্ডিতেরাও এই ব্রহ্মময়ী মায়ের কথা লিখতে দ্বিধা করেন।

আমি তাঁর অহৈতুকী কৃপাপ্রাপ্ত সামান্য গৃহবধু। আমার এই তুচ্ছ জীবনে কয়েকটি বছরের মধ্যে আমি জাগতিকভাবে যে কৃপা ও করুণা মায়ের কাছে পেয়েছি তা পরিবেশন করে গেলাম।

মা আনন্দময়ী সঙ্ঘের ধর্ম্মীয় পত্রিকা আনন্দবার্ত্তা ও অমৃতবার্ত্তায় এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন ভাবে নানা বর্ষে লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তাই ইচ্ছা হলো আমার বংশধরদের ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভক্তদের জন্য লেখাগুলো পুস্তকাকারে সংগ্রহ করে রাখি।

আমার ছোটবোন আগমনী লাহিড়ীর অনুপ্রেরণায় এই কাজ সম্ভব হলো। মায়ের আশীর্বাদ তার উপর বর্ষিত হোক।

জয় মা

মাতৃবাণী-হরি কথাই কথা আর সব বৃথা ব্যথা।

বাসন্তী মৈত্র

[বিক্রয়লব্ধ অর্থ মায়ের আশ্রমে মাতৃসেবায় ব্যয়িত হবে।]

মাতৃবাণী

"সব অবস্থা সব পরিস্থিতিতে ভগবৎ শরণ স্মরণ। নিজ কর্ত্তব্য পালন করা। ভগবানের কাছে আবেদন নিবেদন প্রার্থনা করা।"

পুণা ১৩/২/৮০ ভাস্করানন্দ

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

- মাতৃকরুণায় একটি বিশেষ অংশ — ১১
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৮৯
- আদ্যাশক্তি রূপিনী মায়ের ঘরোয়ারূপ — ১৯
  অমৃতবার্ত্তা ১৯৯৫
- মাতৃকৃপা সিন্ধুর কয়েকটি অমৃতবিন্দু — ২৫
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৯৭
- শ্রীশ্রী মায়ের স্বরূপ প্রকাশ — ৩৩
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৮৭
- শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে শ্রীমৎ শিশিরকুমার ব্রহ্মচারীজীকে লিখিত পত্র — ৩৫
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৯৪
- করুণা পাথার জননী আমার — ৪১
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৭৯
- মাতৃতীর্থ ভ্রমণ কাহিনী — ৫১
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৯৩
- আনন্দরসামৃত — ৬১
  আনন্দবার্ত্তা ২০০০
- স্মরণের দর্পণে — ৬৫
  স্মরণিকা ২০০০
- কৃপাময়ী মা আমার সাক্ষীগোপাল — ৬৭
- আমাদের দিদিমা — ৭৪
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৭৩
- গুরু পূর্ণিমা — ৭৮
  আনন্দবার্ত্তা ১৯৮৭
- মাতৃবাণী — ৮৩

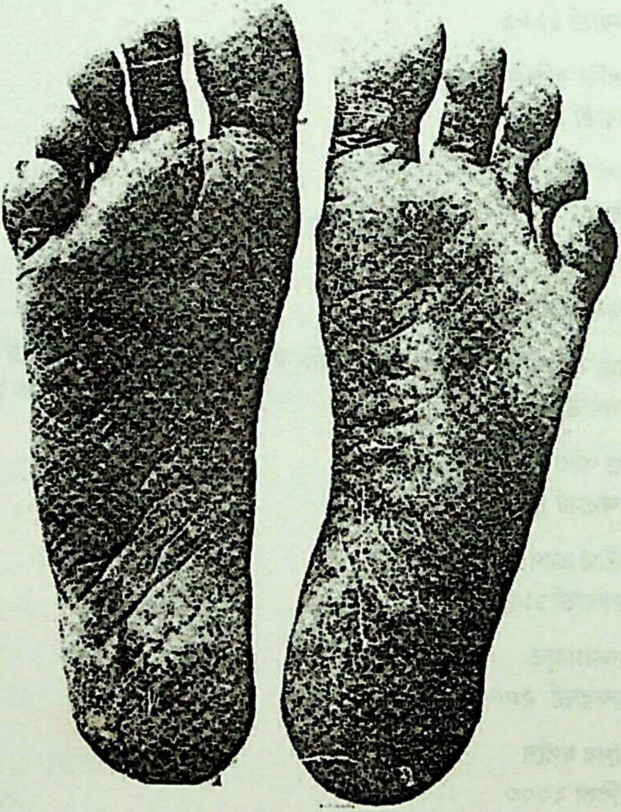

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ

মাতৃ করুণার একটি বিশেষ অংশ

মঙ্গলাচরণ

[ভাগবতী কথা লিখতে বসে মাতৃবন্দনা করে নিই]

জয় মা, শ্রীমা, জয় জয় মা। মাগো একটি মিথ্যা কথাও যেন তোমার সম্বন্ধে জীবনে কখনও না বলি। তবে তোমার ভাষায় কথা আমি সব সময় লিখতে পারলাম না। ভাবার্থ একই থাকল। ক্ষমা কর।

জীবনের সায়াহ্নে এসে ভাবছি জীবনে কি পেলাম? 'কি পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী।'

আমি যে স্বয়ং ভগবতীর করুণাধারায় ও স্নেহাশীষে স্নাত হয়ে এ জীবনে পুষ্ট হয়ে উঠেছি, তার বেশী মনুষ্য জীবনে আর কি কাম্য থাকতে পারে?

করুণাময়ী আনন্দময়ী মায়ের সাথে স্থূলতঃ আমার যোগাযোগ ১৯৫৮ সনের মে মাসে। শিশুকাল থেকে আমার মধ্যে সুন্দর সব স্বপ্ন, দেবদেবী সম্বন্ধে দেখা, ও পূজা করার একটা সংস্কার ছিল। আমার বাবা-মা'র ধর্মজীবন আমাকে অনুপ্রাণিত করত।

সাধু-মহাত্মা-দর্শন করার আগ্রহ শিশুকাল থেকেই আমার মধ্যে ছিল তাই নিতান্ত কৌতুহল বশবর্তী হয়ে আনন্দময়ী মায়ের নাম শুনে দর্শন লালসায় গিয়েছিলাম। তখন মা'র সম্বন্ধে আমি কোনো কিছুই জানতাম না। শুনলাম নির্মল চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ীতে মা এসেছেন ভাগবত সপ্তাহ উপলক্ষে। আমি তখন সাদার্ন এভিন্যুতে ছিলাম। আমার বাবা মা ছোট বোনের সঙ্গে আমি মাতৃদর্শনের জন্য গিয়েছি। অধীর আগ্রহে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ জয়ধ্বনি-মা এসেছেন। গাড়ী থেকে শুভ্রবসনা এক নারীমূর্তি ক্ষিপ্রগতিতে গৃহস্বামীর সঙ্গে উপরে চলে গেলেন। আমার ধারণা ছিল গৈরিকবসনা কোন সাধু হবেন। শুনলাম শ্বেতবসনা উনিই মা আনন্দময়ী। সকলে ছুটছেন প্রণাম করতে, দেখাদেখি আমিও প্রণাম করতে গেলাম। মাঝপথেই

বাধা, পা ছোঁবেন না। দূর থেকে সকলে নমস্কার করলাম। বাবা মাকে নিয়ে বোন চলে গেল। আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু অনুভবে এলো না। শুধু মনে হল এ গতি কি মানুষের? কৌতুহল আরো তীব্র হল। দাঁড়িয়ে রইলাম সেই শুভ্রবসনা জননীকে দেখার আগ্রহে। কিছুক্ষণ পর দেখি তিনি আবার নেমে আসছেন, আমিও সিঁড়ির দিকে এগোলাম। তখন ভিড় অনেক কমে গিয়েছে। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনার পা ছুঁতে দেয় না কেন? মিষ্টি হেসে উজ্বল চোখে আমার দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। আমি দেখলাম মায়ের চোখ দিয়ে একটা নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে, মা যেন আমার ভেতরটা দেখে নিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সেই নীল আলো অন্তর্হিত হল। জানি না সে দৃষ্টিতে কি ছিল। মন প্রাণ একটা আনন্দের স্রোতে ভেসে গেল। আধো আধো ভাবে বললেন "ওরা দেয় না।"

ভিড় বেড়ে উঠল, মা এগিয়ে গেলেন। শ্রীচরণ ছুঁতে দেবে না শুনে মনে ভয়ানক আঘাত লেগেছিল, ভেবেছিলাম আমরা কি এতই পাপী যে মায়ের চরণ ছোঁবার যোগ্যতা নেই। কিন্তু সেই দীপ্তিভরা চোখের চাহনি ও মিষ্টি হাসির কাছে সবকিছু অভিমান ধুয়ে মুছে গেল। কিছুক্ষণ পর আবার দর্শন হল সিঁড়িতে। ২/৪ জন নানারকম কথা, বাড়ী কেনার কথা বলছেন। ঠিক ক'দিন আগেই আমাদেরও একটা ছোট্ট জমির বায়না হয়েছে। ওদের দেখাদেখি আমিও বলে ফেললাম, "মা, আমরাও একটা ছোট জমি কিনেছি।" ঘরোয়া মায়ের মত মা বললেন, "কোথায়?" আমি বললাম বালিগঞ্জ গোলপার্কের কাছে। মা বললেন, "খুব ভাল।" পরে যে মা আমার এই দীন কুটিরে দু'বার আসবেন সেকথা তখন কল্পনাও করতে পারিনি। রাত্রে বাড়ীতে ফিরে স্বামীকে সব ঘটনা বললাম। কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম না। ঘরে আমার মন বসে না, সেই মন্ডপ যেখানে মা বসেন, আমায় দুর্নিবার বেগে টানে। কোনরকমে সংসারের কাজ করে বাচ্চা ছেলেমেয়ের ব্যবস্থা করে ওদের কাজের মেয়েটির কাছে রেখে আমি পাগলের মত চলে যাই। খেতেও ভাল লাগে না মনে হয় সময় নষ্ট হচ্ছে। বিকেলে গিয়ে দেখলাম মাকে বহু লোক মালা দিচ্ছে, মা-ও হেসে হেসে অনেককে মালা পরিয়ে দিচ্ছেন। প্রণামের দলে ভিড়ে গেলাম। আমি কিন্তু প্রথমে দিদিমাকে প্রণাম করলাম, কারণ তিনি তো মায়ের মা। মাকে প্রণাম করলাম কৃপাঘন দৃষ্টিতে তাকালেন কিন্তু মালা দিলেন না। পরদিন আবার গেলাম নিজে মালা দিলাম তাও দিলেন না। বাড়ীতে ফিরতে রাত হয়। স্বামী অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, "ওখানে যাবার কি দরকার?" মালা দেননি বলে মনের মধ্যে প্রচণ্ড অভিমান।

নিজের উপর রাগ হলো, যাব না ঠিক করলাম। কিন্তু প্রবল আকর্ষণ। বাড়ীতে থাকতে পারি না আবারও গেলাম। তখন ভাগবত সপ্তাহ শুরু হয়ে গিয়েছে। শুনলাম মা বলছেন, "ভাগবৎ সপ্তাহে তোমরা সকলে সর্বদা 'ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্র জপ করতে চেষ্টা করবে।" বাড়ী ফিরতে হবে। রাত হয়ে গিয়েছে। নির্জন রাস্তা। সঙ্গী সাথী কাউকে পেলাম না। তখন ভয়ে ভয়ে মনে হল মা যে মন্ত্র বলতে বলেছেন তাই স্মরণ করতে করতে যাই। জনশূন্য পথ। হঠাৎ দেখি এক অপরিচিতা ভদ্রমহিলা হাসতে হাসতে আমার হাতখানা ধরলেন। আমি খুব চমকে উঠে বললাম, "আপনাকে তো এতক্ষণ পথে দেখি নাই, কোথা থেকে এলেন?" তিনি বললেন, "আমিও একলা চলেছি হঠাৎ তোমাকে দেখলাম।" যতখানি পথ নজরে পড়েছিল জনমানব দেখিনি। পরিস্কার টানাপথ হঠাৎ ভদ্রমহিলাকে দেখে প্রথমে অশরীরি কিছু ভেবে শরীরটা অবশ হয়ে গেল। তখন মা'র বলা মন্ত্র সমানে জপে চলেছি ও সত্যি মিথ্যা যাচাই-এর চেষ্টা করছি। মা'র প্রসঙ্গ হচ্ছে, কিছুটা সমালোচনা করলাম, বললাম, "উনি বুঝি বড়লোকদের বেছে বেছে মালা দেন?" ভদ্রমহিলা মায়ের বিষয়ে অনেক জানেন, বললেন, "বড়লোক ছাড়া ওঁকে তো আনতে পারে না, তবে কারো সুকৃতি থাকলে স্বপ্নেও দীক্ষা দেন।" আমার বাড়ীর কাছে এসে ভদ্রমহিলা অন্যপথে চলে গেলেন, কাছাকাছিই থাকেন বললেন।

বাড়ীতে বড় অশান্তি কেন ছেলেমেয়ে ফেলে ওখানে যাওয়া ইত্যাদি। সেবার ৯ই বৈশাখ, মঙ্গলবার অক্ষয় তৃতীয়া ছিল আমাদের গৃহদেবতার পূজা করে আত্মীয় স্বজনকে আপ্যায়ন করে মায়ের দর্শনে চলে গেলাম। সেই রাত্রেই আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখি যে একটি মানুষ ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। কষ্ট থেকে তাকে শান্তি দেবার জন্য আমাকে সকলে তাকে মেরে ফেলতে বলল। আমি তাকে মেরে ফেলামাত্র কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘুম ভেঙে গেল। সকাল থেকে কাজকর্ম পুজো মিটিয়ে আমি দুর্নিবার টানে মায়ের কাছে চলে গেলাম। ভাবলাম মাকে আজ একথা বলবই। একটা মালা কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম। এসে শুনি প্রাইভেট হচ্ছে। private যে কি ব্যাপার বুঝলাম না; সকলের সঙ্গে সেই line.এ দাঁড়িয়ে গেলাম। যেই আমার ঢোকার সময় হল শুনলাম মা অন্য দরজা দিয়ে ছাদে বেড়িয়ে গিয়েছেন। সকলের সামনে কিছু জিজ্ঞাসা করতে স্বভাবতঃ আমার মন চায় না। অসম্ভব ভিড় অথচ কেমন করে জানি না ঠেলাঠেলির মধ্যে মা'র শ্রীচরণে পৌঁছে গেলাম। মাটিতে প্রণাম করে উঠে স্বপ্নের কথা বলতে ভুলে গেলাম, বললাম, "যতটুকু সময় ভগবানকে

ডাকি মনটা তখন কেন স্থির হয় না?" মা বললেন, "ধ্যান জপ কর।" বললাম, "আপনি এ সপ্তাহে যে মন্ত্রটা বলেছেন ওটা রোজ বলছি। তার চাইতে আমি একটা মন্ত্র পাঠ করি সেটা আমার ভাল লাগে।" ঐ মন্ত্রের মধ্যে যে আমার বীজমন্ত্র ছিল আমি তা জানতাম না; মা সেই জায়গাটা শুনে বললেন, "ঐখানটা আবার বল, তুমি ঐ একাক্ষরী মন্ত্রটা জপ কোর্‌বা।" কেমন হতচকিত হয়ে বললাম, "আমি তো জপ জানি না আপনি আমায় জপ শিখিয়ে দেবেন?" কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন — আমার সেই নীল জ্যোতি চোখের মধ্যে দেখলাম। বললেন, "তুমি অপেক্ষা কর।" অপেক্ষার আর শেষ নেই। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। বাড়ীতে বাচ্চা মেয়ে পড়ে আছে। একজন সঙ্গী পেলাম সেও রাগ করে চলে গেল। হঠাৎ মায়ের নজরে পড়লাম। বললাম, "মা আপনি আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছিলেন আর কতক্ষণ থাকব?" তখন মা তাঁর শয়নকক্ষে আমাকে নিয়ে গেলেন ও দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন। জপ করা শিখিয়ে দিলেন। খু-উ-ব কেঁদেছিলাম সেদিন। বললাম, "আমায় কি আর দীক্ষা নিতে হবে?" বললেন, "না আর দরকার নেই।" তখন বললাম, "তাহলে আপনি আমার গুরু?" মা হাসেন আর বলেন, "পাগলী বলে কি, স্বয়ং ইষ্টই তোমার গুরু।" তখন আকুল হয়ে কাঁদি, বলি, "তোমাকে তো আমি অনেক নিন্দা করেছি, বলেছি বড়লোকদের মালা দাও।" বললেন, "তুমি বুঝি মালা পাওনি?" বললাম, "না, আমাকে কখনও মালা দাওনি।" আপনি সম্বোধন কখন তুমি হয়ে গিয়েছে টের পাইনি। তখন মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, "এই আকুলতার জন্যেই তো এই শরীরটার কাছে চলে এসেছ।" নিজের গলার মালা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "আজ তো তুমি খেয়ে এসেছ, আগামীকাল বৃহস্পতিবার তুমি না খেয়ে সকালে এসো।" চোখের জলে মনের সব অভিমান ধুয়ে মুছে গেল। মনটা শান্তিতে পূর্ণ হয়ে গেল। ভরা মন নিয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। আমার স্বামী দীক্ষার কথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হলেন। আবার পরদিন সকালে যখন স্বামীকে বললাম আমি মা'র কাছে যাচ্ছি, মা যেতে বলেছেন, তখন কিন্তু মানা করলেন না। আমার মন থেকে যা যা ইচ্ছা সব কিনে নিলাম। মায়ের দর্শন হবার সঙ্গে সঙ্গে মা শোবার ঘরে ডেকে নিলেন। বালিশের তলা থেকে একটা কাগজ বের করে দিলেন। অন্যান্য যা করতে হবে বলে দিলেন, জপ ভাল করে শিখিয়ে দিলেন। দিদিকে ডাকলেন, দিদি আমাকে মাকে কাপড়টা জড়িয়ে দিতে বললেন, খাইয়ে দিতে বললেন, সব করলাম। মা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে অনেক মালা পরিয়ে দিলেন। আনন্দ অশ্রুতে

বুক ভেসে গেল। সেই বছর আগরপাড়ার আশ্রমের উদ্বোধন হবে। তার নেমন্তন্ন পত্র দিদিকে দিতে বললেন। নানা ব্যাপারে আমার আর আগরপাড়া যাওয়া হল না।

সে বৎসরই পূজার পর কাশী গিয়েছি। আশ্রমের কেউ আমাকে চেনে না, আমিও কাউকে চিনি না। মাতৃদর্শন করতে আমার স্বামী ও জা সঙ্গে গিয়েছেন। রাত ৭টা। মা, মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে ঘরে বসে কথাবার্তা বলছেন। দর্শনের কথা বলাতে সকলে বলল এখন দেখা হবে না। আমি নামটা বললাম ও ডাকলে যাব বললাম। মা নাম শুনে ডেকে পাঠালেন। আমার স্বামীকে প্রথম দেখলেন, দেখে বললেন, "বাবা বেশ ভাল লোক, দু'জনে বেশ মানিয়েছে।" আমি তো অবাক, আমার দীক্ষা নিয়ে স্বামী খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন, কত রাগারাগি করেছেন। আমার স্বামী ভগবৎবিশ্বাসী, কিন্তু গুরুকরণ পছন্দ ছিল না।

আমি জপ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন মাকে করলাম, মা বললেন, "মাটিতে বীজ পুঁতে যদি বারবার তুলে দেখ কবে গাছ হবে, তাহলে গাছ হওয়া দূরের কথা, বীজই নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই যে নাম বা বীজ পেয়েছ তা সযত্নে লুকিয়ে রাখ। চলতে-ফিরতে, শ্বাসে-প্রশ্বাসে সে বীজমন্ত্র সর্বদা স্মরণ করবে, ফলাফলের জন্য ব্যস্ত হয়ো না, সময় হলে সব হবে।" আমার জা দীক্ষা নেবেন বললেন। মা বললেন, "এ শরীর তো দীক্ষা দেয় না।" আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ওর জিনিষ ওর মধ্যেই ছিল তাই ওর হয়েছে।" তারপর আমি ছোটবেলা থেকে জগন্নাথ দেবকে ভাইফোঁটা দিই শুনে খুব হেসে বললেন, "বাবা সংসারী হয়েও এর ভাবটি কেমন সুন্দর। জগন্নাথদেবকে ভাইফোঁটা দেওয়া এ তো কখনও শুনি নাই।" এই বলে কবিরাজমশায়কে বললেন "বাবা, এদের হাতে তুমি সংযম সপ্তাহের কাগজ দাও, ওদের হবে।" কি হবে জানি না। তবে সেদিনের সেই প্রেরণা নিয়ে ভরা প্রাণে কলকাতা ফিরে এসেছিলাম।

এর কিছুদিন পর অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে মা আবার আগরপাড়া আশ্রমে এলেন। শুনে আমি একটা পোষ্টকার্ডে মাকে আমার নতুন বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবার জন্য প্রার্থনা জানালাম। ছোট বোন আগমনী শুনে রাগারাগি করল, বলল, "চিঠি দিলি, তিনি কতো মহান, যেয়ে বলতে পারলি না।" তখন আমি কলকাতার রাস্তাঘাট চিনি না। স্বামীও নিয়ে যাবেন না। কাজেই আগমনী তখন আমাকে নিয়ে আগরপাড়া গেল। মা গাড়ীতে উঠেছেন, শুনলাম Lake Gardens. এ কোন বাড়ীতে যাচ্ছেন। আমি ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে বললাম, "মা, আমি চিঠি দিয়েছিলাম।" মা বললেন,

"তোমার চিঠি পাইছি, তুমি স্বামীজীকে গিয়ে বল।" মা আমার হাতে একটা ফল দিলেন, বোনকে মালা দিলেন, গাড়ী চলে গেল। স্বামীজীকেও তখন ভাল করে চিনি না। বাড়ীও চিনি না। আগমনী বলল, মা যে বাড়ী যাবেন, তা ও চেনে আমাকে নিয়ে যাবে। মা রওনা হয়ে যাবার পর আমাকে নিয়ে ও বাড়ী ফিরে এল। ঠাকুরকে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে এসে দেখি letter box. এ আমার নামে একটা চিঠি। বাড়ীর কাজের মেয়েটি বলল একটি ছেলে এসে দিয়ে গিয়েছে। খুলে দেখি সারদেশ্বরী আশ্রমের দুর্গাপুরী মা আমার নামে চিঠিটা দিয়েছেন (চিঠিটা আমার কাছে এখনও আছে) আমাকে তিনি চেনেন না বা কখনও দেখেন নি। আমি তাঁকে দেখিনি। ২/৩ দিন পর নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে কিছু জিনিষ নিয়ে আমাকে যেতে লিখেছেন এবং এমনভাবে চিঠিটা দিয়েছেন আমি যেন তাঁর বহু পরিচিতা। চিঠিটা পেয়ে আমি খুবই চিন্তিত। যাইহোক মায়ের দর্শনের জন্য Lake Gardens. এর বাড়ীতে বোন নিয়ে গেল। মা'র সাথে দেখা হলো। মা বললেন, "কবে যেতে বলছো?" সেদিন ছিল ৫ই ফাল্গুন। ৭ই ফাল্গুন আমার জন্মদিন ছিল তাই মাকে ৭ই ফাল্গুন আমাদের নতুন বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে বললাম। ৬ই ফাল্গুন নাগমশায়ের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে কনকদার বাড়ী থেকে মা তাঁর বাড়ী আসছেন। বললেন, "এত তাড়াতাড়ি কি হবে? পরমানন্দকে বল সে যদি বেড়াতে যাবার সময় নিয়ে যায়।" স্বামীজী শুনে বললেন, "মা যখন বলেছেন যাওয়া হবে, তুমি ঐদিন নাগেদের বাড়ী থেকে বিকালে নিয়ে যেও।"

বাড়ী তো তখন হয়নি, সবে ছাদ ঢালাই হয়েছে। এই কয় মাসে মা সম্বন্ধে বই পড়ে ও সকলের মুখে অসাধারণ কাহিনী শুনে খুব ভয় হচ্ছে। আমার ভাড়াটে বাড়ী থেকে সব সাজিয়ে আনলাম। আমার মা হরিলুট দেবার বাতাসা এনেছেন দেখে খুব চিন্তিত হলাম, যদিও আমার মনেও সে বাসনা ছিল। ছোট্ট জায়গা। একটু কীর্তন হয় তাও মনে মনে ইচ্ছা। এদিকে আমার স্বামী কড়াপাকের সন্দেশ এনেছেন। আমি ফুলের মালা এনেছি এবং তার সঙ্গে সুন্দর একটা মালা এনেছি চূড়ায় পড়াবার জন্য। এতো ছোট জায়গা। নতুন বাড়ী হচ্ছে। চারিদিকে ধূলো বালি। বড় ভয় হচ্ছে। মাকে আনতে গেলাম। মা নাকি আগের দিন গীতশ্রী ছবি ব্যানার্জীকে বলে রেখেছিলেন "কাল এই শরীর এক বাড়ীতে যাবো তুই সঙ্গে থাকবি।" ছবিদির মুখে কীর্তনের রাতে একথা শুনলাম। আমি বিকেল ৪টায় গিয়েছি, মা এসে একটা গাড়ীতে বসলেন। ছবিদি মা'র পায়ের কাছে বসল। স্বামীজীও গাড়ীতে উঠে

বললেন, "তুমিও এই গাড়ীতে চল।" আমিও মা'র পায়ের কাছে বসলাম। তখন দুর্গাপুরী মায়ের চিঠির কথা মাকে বললাম। মা বললেন, "নিশ্চয়ই যাবে এবং কি কথা হয় পরে এসে এ শরীরটাকে বলবে।"

প্রথম দর্শনে মায়ের মাথায় চূড়া দেখেছিলাম। চূড়ায় মালা পড়ার বড় সাধ ছিল। এবার দেখছি রোজই চুল খোলা। তবুও ভয়ে ভয়ে বললাম, "মা তোমার মাথার চূড়ায় ফুলের মালা দেওয়া দেখতে আমার বড় ইচ্ছে করে।" মা বললেন, "সব সময় খেয়াল আসে না।" স্বামীজী বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা, করবে।" আমি বললাম, "মার চুলে হাত দিতে আমায় ভয় করে, ব্যথা পাবেন। আমি পারব না।" আমার সাধ্যমত আয়োজনে গ্যারেজের মধ্যে মাকে এনে বসালাম। পশ্চিম মুখে বসে আমার মা ও আমি চরণ পূজাও করলাম। তখন দিক্‌বিদিকের জ্ঞানও ছিল না। মা বললেন, "এটা গ্যারেজ নাকি?" সকলে হ্যাঁ বললেন। মা বললেন, "তা গ্যারেজই আমার বাড়ী।" আমি বাতাসা আনলাম। কীর্তনের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মা ছবিদিকে কীর্তন করতে বললেন। হারমোনিয়াম ইত্যাদি কিছুই নাই। কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মা মহা আনন্দে বাতাসা ও কড়াপাকের সন্দেশ ছড়াতে লাগলেন। আমার মায়ের ও আমার ইচ্ছা পূরণ হল। আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল। তারপর সকলকে ডেকে ডেকে মালা পরিয়ে দিলেন। গাড়ীতে বসে ছেলেমেয়েকে নাম ধরে ডেকে আবার মালা পরিয়ে দিয়ে চুলগুলো তুলে বেশ আঁটোসাঁটো করে একটি চূড়া বাঁধলেন। আমি চুপচাপ তাকিয়ে আছি। আমাকে ডেকে বললেন, "কোথায়? চূড়ায় মালা পড়াবা বলছিলা না, দাও।" বিহ্বল আমি, মালা খুঁজে পাই না, স্বামীজী বললেন, "এই কোলের থেকে তুইলা একটা দে।" বড় মালা দিলে ব্যথা পাবেন বলে আমি ছোট মালাটা খুঁজছি, চট্ করে পেয়ে গেলাম। মালা পরিয়ে দিলাম। দিব্যবিভায় চতুর্দ্দিকে যেন আলোকিত হয়ে উঠল। মা বললেন, "খুশী হইছো তো?" সেদিনও বৃহস্পতিবার ছিল। মা চলে গেলেন আমাদের জীবন সফল করে। এরপর ১৯৬২ সনে দুর্গাষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলা মা আমার এই অতি ছোট্ট বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন চতুর্দ্দিকে বৃষ্টি, কিন্তু আমার বাড়ীতে বৃষ্টি পড়ছিল না। সে কাহিনী লিখতে গেলে অনেক লিখতে হবে। পরদিন নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীতে দুর্গাপুরী মা'র কাছে গেলাম। চিঠি দেখিয়ে বললাম আমি তো আপনাকে চিনি না। উনি বললেন, "তুমি আমার বহু পরিচিত" ইত্যাদি অনেক কথা। ফিরে এসে পরদিন মা'র আদেশ মত মাকে সব কথা বললাম। সব কথা শুনে মা আমাকে সেদিন বিশেষ কৃপা করে

অনেক কিছু বললেন তা লেখা যাবে না। তারপর মা বললেন, "আজ এখানে রাত্রে মেয়েদের কীর্তন আছে তুমি উপস্থিত থাকবে।" আমি বললাম, "তোমার বাবা যদি না আসতে দেন।" মা বললেন, "বোলো মা যেতে বলেছেন। সে যদি না আসতে দেয় এস না।" গৃহস্বামী মুখ ভার করে আছেন, কিন্তু যেতে মানা করলেন না। সন্ধ্যাবেলা কীর্তনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। লাল বেনারসী পড়ে ফুলের সাজে সজ্জিত আমার চিন্ময়ী মা অতি প্রসন্নতার সঙ্গে আমাকে ডেকে কাছে বসতে বললেন। গুরুইষ্ট যে অভেদ তাই বুঝিয়ে দিলেন মিষ্টি হাসি দিয়ে। এর আগে আমাদের আশ্রমের কীর্তন কখনও তো শুনি নাই নিজে কীর্তন করতেও পারি না। মায়ের সাথে মঞ্চে ঘুরলাম। মা আমাকে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে বললেন। ছবিদি, পূর্ণিমাদিকে মা ফুলের মুকুট, মালা পরিয়ে খুব আনন্দ করতে লাগলেন তারপর বিশ্রামে গেলেন।

হঠাৎ রাত ৩টার সময় বাড়ী থেকে রান্নার ছেলেটি এসে বলল, "বোন কাঁদছে, বাবা রাখতে পারছে না আপনি বাড়ী চলুন।" অতো রাত্রে মাকে বিশ্রামের সময় বিরক্ত করতে সংকোচ বোধ করলাম তাই না বলেই বাড়ী চলে এলাম। পরদিন সকালে মাকে বললাম কীর্তনে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারিনি, দোষ হবে না তো। মা বললেন, "না হবে না।"'

এই আমার প্রথম বছরের দর্শনের সত্য কাহিনী।

জয় মা।।

আনন্দ বার্ত্তা বর্ষ ৩৬, জানুয়ারী ১৯৮৯, সংখ্যা ১

আদ্যাশক্তি রূপিনী মায়ের ঘরোয়া রূপ

'শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্ননি।' পৃথিবীতে এই শ্রেয়কে লাভ করবার চেষ্টায় যাঁরা একটু এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন প্রতি মুহূর্তে এই বাধা তাঁদের অতিক্রম করতে হয়। 'ক্ষুরস্যধারা' পথ। প্রতিমুহূর্তে পদস্থলন, প্রলোভন অপেক্ষা করে। এসব অতিক্রম করার পন্থাও কৃপাময়ী জোগান। তিনি যখন কাছে টানেন তখন নানা বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ধৈর্য্যের পরীক্ষায় যে জেতে করুণা তখনই তিনি বর্ষণ করেন। আদ্যাশক্তিরূপিনী মায়ের এই ঘরোয়া রূপ দর্শনের ভাগ্য আমার বহুবার হয়েছে।

কতশত জন্মের পুণ্যের ফলে আমরা মাকে পেয়েছি তা জানি না। এই নরদেহ ধারিনী মাকে বোঝা বড়োই শক্ত ছিল। তিনি যতটুকু যে আধারকে বোঝানোর দরকার ঠিক ততোটুকুই দিয়েছেন। এই তো মা। মেপে মেপে যে সন্তানের যা দরকার তাই দিতেন, এখনও দেন।

তাগিদ এসেছে অমৃত বার্তার আনন্দে অমৃত সিঞ্চন করার। অমৃত বিন্দুগুলো আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত আছে। সর্বদা তা প্রকাশিত হয় না বা জোর করে হয় না। যখন আসে তখন বাধা মানে না।

১৯৫৮ সনে মাকে প্রথম দর্শন। ৭ দিনের মধ্যেই দীক্ষা লাভ। তখন মায়ের প্রবল আকর্ষণ আমার জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। চোখের জলের পিছল পথে আমার মাতৃ সকাশে যাত্রা। অর্ন্তযামিনী সব বুঝতেন ও কৃপাসিন্ধুর অমৃত সিঞ্চন করে যেতেন। জীবনের শ্রেষ্ঠকৃপা পাবার পর কি পরিমাণ বাধা বিঘ্নের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে তা যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন জানেন। মা আমাকে টান্‌তেন চুম্বকের মতো। আমার বুকের মধ্যেটা শ্রী শ্রী ঠাকুরের সেই গামছা নিগড়ানোর অবস্থা। অথচ যে স্বাধীন জীবন আমার ছিল দীক্ষার ফলে সেখানে এসে পড়লো দারুণ বিপত্তি। গৃহস্বামী ভগবৎ ভক্ত। আমার চাইতে তাঁর পূজো পাঠ অনেক সময় সাধ্য। দীক্ষা পাওয়া যেনো অপরাধ হয়ে গেল। মার কাছে যেতে চাইলে বাধা দেয় না। অথচ তার after effect বড়োই অসহনীয়। তখন কাজের মেয়েটা বলতো, "মা ও পথ ছাড়ো। বাবু পাগল হয়ে যাবে।" কিন্তু ছাড়া ধরা দুটোই তখন আমার

নাগালের বাইরে।

স্বামী সন্তান সকলকে ভালবাসি। কর্ত্তব্য কর্ম কখনও অবহেলা করি নাই। কিন্তু এই জাগতিক ভালবাসা আর মার প্রতি ভালবাসায় আকাশ পাতাল তফাৎ। মাকে ভালবাসা, তার প্রতিদান পাওয়া সে যে কতো আনন্দের তা তো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ঐ অপার্থিব ভালবাসা, ব্রহ্মানন্দ, তা জগতের সব কিছু ভুলিয়ে দেয়। সংসারে যখন এরকম অশান্তি যাচ্ছে মনে হতো, "দূর ছাই সকলে তো মার কাছে ছুট্‌ছে না, আমারই বা এতো টান কেন?" এই ভেবে ও পথ থেকে সরে আসতে চেয়েছি কিন্তু প্রেম সমুদ্র তখন উত্তাল, সরা তো দূরের কথা আরো বাঁধা পড়ে গিয়েছি। সেই আনন্দবন্ধন থেকে মুক্তি নেই। আর সে বন্ধন কতো রসাল কতো স্বাদু তা আমি প্রতিক্ষণে উপভোগ করতাম।

মা এসেছেন নাগমশায়ের গৃহ প্রবেশে। আমাদের বাড়ীও তৈরী হল। আমার অনুরোধে মা এসে পদধূলি দিয়ে গেলেন। তখন সকলেই আনন্দিত। আমি রোজ যাচ্ছি এই নিয়ে আবার অশান্তি। রাগ করে আমি বললাম, "কি তোমার হয়? চলোনা মার কাছে আমার নামে নালিশ করো। মা যেতে মানা করলে আর যাব না।" প্রথমে রাজী হল না। রাত তখন প্রায় ১২টা। হঠাৎ বললো, "চলো"। আমার চোখের জল তখন সেই চরণ কমল ধুইয়ে দিয়েছে। প্রেমের রজ্জুতে টান পড়েছে। সাদার্ন এভিন্যু লেকের কাছে ছিলাম। রাসবিহারী এভিন্যু নাগমশায়ের বাড়ীর দূরত্ব বেশী নয়। তবে এতো রাতে। আমি তখন সকলের কাছেই অপরিচিতা। মাকে পরীক্ষা করার সুযোগ ছাড়লাম না। গাড়ী রিক্সা কোনো বাহানা করলাম না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে পৌঁছে গেলাম প্রায় রাত সোয়া বারোটায়। আশ্রমের সাধু শম্ভুদা তখন উপস্থিত। উনি সব শুনে বললেন, "দিদি, তুমি নারী হয়ে এক মহীয়সী নারীর জন্য কাঁদছো, আর আমি পুরুষ হয়ে যখন তাঁর জন্য কাঁদতাম, কত অপমান, কত লাঞ্ছনা সহ্য করেছি। তুমি চিন্তা করো না। মা তোমাকে রক্ষা করবেন" মনে বল পেলাম। স্বামী পরমানন্দজী বললেন, "মা এইমাত্র বিশ্রামে গেলেন। এখন কি দেখা হবে? অপেক্ষা কর, বলে দেখি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে মা ঘরে ডাকলেন। মা খাটে বসে আছেন। মনে হলো আমারই প্রতীক্ষায়। মায়ের দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে কেঁদে ফেললাম। কিছু কিছু বললাম। মার কাছে অনেক বলবো ভেবে চিন্তে গেলেও কিছুই বলা তো হল না।

বলবার দরকারও হল না। অর্ন্তযামিনী সব বুঝে নিলেন। বললেন, "বাবা, তোমার কি মনে হয়?" তখন বলে ফেললো, "রাজসাহীর অটলবাবু ও গিরিজাবাবু আমার প্রফেসর ছিলেন। ওঁরা আপনার কাছে আসেন তাই আমি কিছু বলতে পারি না। তবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে ফেলে অন্য বাড়ীতে ঘুরে বেড়ানো আমি পছন্দ করি না। যেতে হয় আশ্রমে যাক্।" অথচ এই আশ্রম ভীতিই চূড়ান্ত অশান্তির কারণ ছিল। সব ফেলে যদি আশ্রমবাসী হই সেটাই আসল ভয়। মার কাছে উল্টো বললো।

মা বললেন, "হ্যাঁ বাবা, এতো ঠিক কথাই।" তারপর একটা তুলসীমেশানো অটল ফুলের মালা নিয়ে আমার ও এর হাত বেঁধে দিলেন। তারপর বললেন, "বাবার কথা শুনবে, বাবাকে প্রণাম করো।" করলাম। তারপর মাকে প্রণাম করতে গিয়ে চোখের জলে বুক ভেসে গেল। মা আমার মাথায় বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। ঐ দুঃসহ অভিমান, মনোকষ্ট নিয়ে গিয়েছি তবুও মনে হলো আমাকে মা এতো আদর করলেন, ওর মাথায় তো হাত দিলেন না। বললাম-ওকে আশীর্বাদ করে দাও। মার সে কি মিষ্টি হাসি। হাসতে হাসতে ওর মাথা পিঠ সব হাত বুলিয়ে দিলেন। মার কথায় তখন দেখি খুব শান্ত ও খুশীতে ভরপুর। তারপর মা আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "বাবা যা বলে, তা শুনবে।" আমি প্রথমে মাথা নাড়লাম সম্মতিসূচকভাবে। তারপর বললাম, "আচ্ছা মা, তোমার বাবা যদি অন্যায় বলে তাও মানতে হবে নাকি? মা তখন হাসতে হাসতে বললেন,, "না, তখন তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলবে, ঝগড়া করবে না। এখন বাড়ী যাও, বিশ্রাম করো।"

দু'জনে বাড়ী ফিরে এসে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর মা কতবার এলেন। আমি মাতৃসঙ্গ করতে যেতাম। মার বাবা মনে মনে পছন্দ করেনি, কিন্তু কোন অশান্তি করেনি। ধীরে ধীরে ঐ ভাবটা চলে গেল। নিজের থেকেই মার কাছে যেতে চাইতো। মা আমার হৃদয়ের সুগভীর ক্ষত করুণার মলমে সারিয়ে তুলেছেন। কিন্তু নির্বীজ হওয়াটা প্রারব্ধ কর্মের উপরে তো নির্ভর করে। কাজেই প্রারব্ধ মাঝে মাঝে বলবান হয়ে উঠতো।

এর কিছুদিন পর মা পূজোর সময় আগরপাড়া এলেন। আমি তো আনন্দে আত্মহারা রোজ মার কাছে যাব বলে। হঠাৎ পঞ্চমীর দিন গৃহস্বামী বললেন, "আমি ষষ্ঠীর দিন বহরমপুর যাচ্ছি।" ওখানে আত্মীয় ছিলেন। কোনদিন যাবার কথা শুনিনাই। আমি ভয়ে কোন বাধা দিলাম না। বোনপো অমলকে নিয়ে মার

কাছে সপ্তমীর দিন প্রণাম করতে আগরপাড়া গেলাম। মা বললেন, "কাল অষ্টমী পূজায় এসো।" আমি বললাম, কালতো আসা হবে না। মা বললেন, "চেষ্টা কোরো, দেখো কি হয়।" অমলকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। আমাকে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। অমল আর নিয়ে যেতে পারবে না। ওর কাজ ছিল। সেদিনই হঠাৎ মধ্যরাত্রে কর্তার আর্বিভাব। আমি তো অবাক্ পূজোর পর আসার কথা। এ কি হলো। জিজ্ঞাসা করাতে আবছা উত্তর কি যেনো দিল।

পরদিন অষ্টমী পূজো। মার কাছে যাবার জন্য তাড়াহুড়ো করলো। এই হলো মাতৃকৃপা। অষ্টমী পূজোতে মাকে পূজো করলাম। মা কত খুশী, খুব হাসতে লাগলেন। বাবার মাথায় হাত বুলালেন। ভাবলাম যাক্ পূজোটা শান্তিতে কাটবে। নবমী দশমী আনন্দে কাটলো। একাদশীর দিন খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে গৃহকর্ম কিছুটা করে পূজো করতে বসলাম। মাকে বিজয়ার প্রণাম করতে যাবো বলে গাছের ফুল চন্দন দিয়ে রেখে দিলাম। হঠাৎ দেখি বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। বল্লাম, "মাকে প্রণাম করতে তো যাব?" বললো, "না যাওয়া হবে না বোনের বাড়ী যাচ্ছি।" এদিকে চোখের জলে ঠাকুরের আসন ভিজলো। আমি রাস্তাঘাট চিনি না। এক্লা যেতেও পারবো না। হঠাৎ ঘন্টা দুয়েক পর phone এলো বন্ধুর মা মাসী মাকে দেখতে চান, তুমি চলো। রাগ করে ফোন কেটে দিলাম।

পূজো করতে বসে মনে হলো রাগ করে না গেলে আমারই ক্ষতি। সুতরাং আবার phone. এর সঙ্গে সঙ্গে বললো প্রস্তুত থাকো, ওদের গাড়ী যাচ্ছে। গাড়ী নিয়ে ও নানা বিভ্রাট গেল। রাস্তা থেকে ফল মিষ্টি নিয়ে দুই বিধবা বুড়ীর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত আগরপাড়া পৌঁছালাম। মা পূজো মণ্ডপের বারান্দায় বসে, অসাধারণ ভিড়। পূর্ণদাস বাউল গান করছেন। ভাব গম্ভীর পরিবেশ। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছি। মা ইশারা করলেন বসতে। ওদিকে সঙ্গীরা ফেরবার জন্য পাগল। গান শেষে মা জালির বারান্দার কাছে দাঁড়ালেন। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। একটা চাঁপা ফুল হাতে দিয়ে বললেন, "আজ সকাল থেকে তোমার কথা বারবার খেয়ালে আসছিল।" আমি তো কেঁদে ফেললাম। বললেন, "তুমি অপেক্ষা করো।"

ওরা তখন বললেন, আজ একাদশী আমরা বাড়ী যাবো। তোমাকে তো মা থাকতে বললেন তুমি থাকো। আমি বললাম, তাহলে আপনারা আমার বাড়ীতে এ খবরটা জানিয়ে দেবেন। মা যে থাকতে বলেছেন এ কথাটা বলবেন। ওঁরা বললেন,

আমরা বলে দেব। তোমার এখন যাওয়া উচিৎ হবে না। ওঁরা চলে এলেন আমি তো বেঁচে গেলাম। মার কাছে সুযোগ মতো ঢুকে পড়লাম। আবার ও বললেন, "সকাল থেকে তোমার কথা খেয়াল হচ্ছে।" আমি বললাম, সেই জন্যে আমাকে এতো কষ্ট দাও কেন? খুশি মনে প্রসাদ খেয়ে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সোজা ননদের শাশুড়ীকে প্রণাম করতে চলে গেলাম। ননদ সব শুনে সহানুভুতির সঙ্গে বললো চা খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে বাড়ীতে একটা phone করে দাও। phone বেজে গেল। রাগের ঠ্যালায় ধরলো না। বাড়ী ফিরে এসে দেখি মেয়ের খুব জ্বর তাকে নিয়ে শুয়ে আছে। আমি মাকে কাতর প্রার্থনা জানিয়ে মার প্রসাদ মেয়েকে খাইয়ে দিলাম। আর কোন অশান্তি হলো না। রাত ১২টার মধ্যে জ্বর নেমে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এইভাবে ঐ পরমস্বরূপা করুণাময়ী মা আমাকে ঘরোয়া মায়ের মতো আগলে রাখতেন। ঐ সব দিনের কথা ভাবলে আজও আমার চোখ জলে ভরে ওঠে। এরকম বহু ঘটনা জীবনে ঘটে গিয়েছে মা দূর থেকে সব দেখতেন বলতেন। আমরা যদি ঠিক চাওয়ার মতো চাইতে পারি সে প্রার্থনা জগৎজননী সঙ্গে সঙ্গে ফলপ্রসূ করেন। সাধু-মহাত্মারা সর্বক্ষণ তাঁরে স্মরণ করেন ও তাঁকে সর্বদা পান।

আমাদের চিত্ত যখন প্রকৃত শুদ্ধ থাকে তখন যেটুকু করুণা পাই, তাই মহার্ঘ্য। মার ভগবতী স্বরূপের একটা দিক যে মার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে মা আমাদের সব ভুলিয়ে দেন। মাকে ঘরোয়া মা হিসেবে পাওয়াটাই আমাদের কাছে চরম ও পরম কাম্য।

জয় মা।

অমৃত বার্ত্তা জানুয়ারী ১৯৯৫ সংখ্যা ১

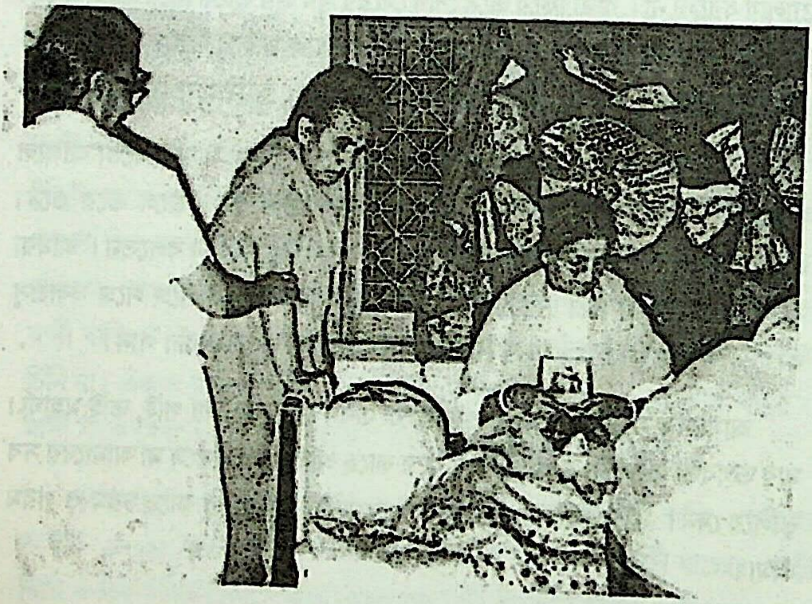

লেখিকার মা-কে গোপালরূপে পুজো

মাতৃকৃপা সিন্ধুর কয়েকটি অমৃত বিন্দু

জয় মা

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহনীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম।।

বিগত ১৯৫৮ সন থেকে ১৯৮২ সন পর্যন্ত মায়ের অলৌকিক, অমৃতময়ী কৃপা পেয়েছি। যাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী তাঁরা আমাকে এসব লিখতে বলেন কিন্তু এ যে আগুন, এ নিয়ে ছেলেখেলা তো চলে না। আমাকে যাঁরা স্নেহ করেন বলেন, "তুমি লেখো, উত্তর পুরুষ পড়ে যদি আনন্দ পায়, সেটাই তো সার্থকতা।" সব কথা লেখা হবে না, যতোটুকু পারি মাকে স্মরণ করে লিখি কারণ মা বলেছিলেন দীক্ষার সময়, "গুরুমন্ত্র ও সরস্বতী মন্ত্র একই, বুঝলা।" ঐ অগাধ সিন্ধু মাপার ক্ষমতা তো কারো নেই, অথচ যে সেই অমৃত সিন্ধু স্পর্শ করেছে, সামান্য একটু অমৃত লাভ তো করেছেই।

প্রথম দর্শনেই বুঝেছিলাম আমার ইষ্ট নরদেহ নিয়ে এসেছেন। এই বদ্ধমূল ধারণা মাকে বলেছি। মা হেসে বলেছেন, "হ্যাঁ তাতো জানি।" দেবীভাব সর্বদার বোধে কখনো কখনো তো থাকতো না, গর্ভধারিণী মায়ের মতো ব্যবহার হয়ে যেতো। এই ব্যাপারে মা কন্‌খলে একদিন বললেন, "তোরা তো এ শরীরটার নিজের লোক, তবে কেন এতো ইতস্ততঃ করিস।" কখনো কখনো মাকে অতি সহজ মনে হতো, আবার কখনো কখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতেন, তখন কথা বলতে ভয় করতো। মা যে কাউকে চেনেন তাও মনে হতো না। মার এসব ভাবান্তর বোঝা শক্ত ছিল। প্রথমটা অভিমান হতো কিন্তু সঙ্গ করতে করতে এসব সামান্য কিছু বুঝতে পারতাম। একবার দিল্লী হয়ে মা পুণা যাচ্ছেন। যথারীতি ষ্টেশনে গিয়েছি উদাসজীর হাতে অনেক জিনিষ দেখে আমি Overbridge পার হবার সময় মার হাতটা ধরলাম। ভিড় ছিল না তাই সাহসটা হয়েছিল। হঠাৎ মা নিজে আমার হাত ধরলেন ও পটপট করে সিঁড়ি ভেঙে উঠে পড়লেন। Platform-এ ঘুরছেন আমি একটু পিছনে আমাকে বারবার বলছেন "ভালো আছো তো?" আমি ভালো ছিলাম বললাম হ্যাঁ। ৩/৪ বার একই প্রশ্ন করলেন আমিও এক উত্তর দিচ্ছি। ভাবছি

একথা বার বার বলছেন কেন? এদিকে পুণায় মায়ের উপস্থিতিতে তো নামযজ্ঞ হচ্ছে। সেদিন রাত্রে দিল্লীতে শরীর ভীষণ খারাপ। বমি, পায়খানা। মরার মতো। আমি কিন্তু নামযজ্ঞের কথা তখন জানি না। ডাক্তার বদ্যি এলো শরীর ভীষণ দুর্বল। তার দিন পাঁচেক পরে একটি অপরিচিত ছেলে এসে বললো, "আপনার নাম কি বাসন্তী মৈত্র। নামযজ্ঞের সময় পুণায় মা বারবার আপনার নাম বলেছেন এবং এই প্রসাদটুকু আপনাকে দিতে বলেছেন আমি স্বরূপদার কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে এসেছি।" করুণাময়ীর এ কি করুণা। এইজন্য দিল্লী ষ্টেশনে অতোবার কেমন আছো জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কতো ঘটনা যে এরকম আছে তা লিখে শেষ হবে না। কোথায় পুণা আর কোথায় দিল্লী। মার এতো খেয়াল ছিল।

প্রথম দর্শন ১৯৫৮ সনে ও সাতদিনের মধ্যে দীক্ষা, সে সব ঘটনা তো আগেই লিখেছি। দ্বিতীয় মাতৃসঙ্গ পিলানীতে সংযম সপ্তাহে। বোধহয় ১৯৬১ সন। আমার স্বামী তো রাগের মাথায় মাকে বলেছিলেন দীক্ষার ঠিক পরে যে, "লোকের বাড়ী বাচ্চাদের ফেলে ফেলে যায় আমি পছন্দ করি না, আশ্রমে যায় যাক।" ভূতের মুখে রাম নাম, আশ্রম বলতে তো মহাভীতি। একথা ভাবাই আমার পক্ষে কল্পনাতীত ছিল।

তাই যখন পিলানীতে সংযম সপ্তাহ হবে এবং সুগায়িকা ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়রা সব যাচ্ছে শুনে আমিও গুরুসঙ্গ করার আশায় ওদের সঙ্গে যাবো বলে স্বামীকে বললাম, এক কথায় রাজী। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। ভেবেছিলাম ছবিদিকে মা এতো ভালবাসেন ওর সঙ্গে গেলে হয় তো মার কাছাকাছি থাকতে পারবো। আশ্রমের নিয়ম কানুন কিছুই আমি তখন জানি না। বিশেষ কাউকেও চিনি না। পৌঁছে ছবিদি তো মায়ের কাছাকাছি শুদ্ধাচারীদের সাথে থাকলো, আমাকে স্কুলের একটা room.এ থাকতে দিল তবে গোপাল ঠাকুর মহাশয়ের মেয়েরা ওঘরে থাকাতে আমার খুব ভালো লেগেছিল। সংযমের মধ্যে ১ দিন ধ্যানে বসে আমি কিছু শুনলাম। সত্যি মিথ্যা জানি না। মাকে সব বললাম। মা বললেন, "খুব ভালো।" সত্যি কিনা জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "তোমার তা দিয়ে দরকার কি? খুব ভালো। ব্যস্। তখন দেখলাম অনেক ভক্তেরই বিগ্রহ আছে। তাঁকে সাজিয়ে পূজো করে উৎসব করে তাঁরা খুব আনন্দ পায়। আমি মাকে বললাম, "আমার ইষ্ট তো দেবী। তুমি আমাকে একটি দেবীমূর্ত্তি দেবে?" তখন আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল, বয়েসও কম। মা হঠাৎ বললেন, "তোমার শরীরটা তো ভালো না, দেবীর সেবা অপরাধ

হলে, খারাপ হয়।" আমি তো অবাক, এসব তত্ত্বকথা কিছুই বুঝতাম না। দর্শন সম্বন্ধে মা একটু প্রশ্রয় দিয়েছিলেন বলে সাহস বেড়ে গেলো। বললাম, "তাহলে একটি সোনারবরণ বালগোপাল মূর্তি দাও। সে তো বাচ্চা কাজেই কোনো অপরাধ নিশ্চয়ই হবে না।" মা শুনে বললেন তুমি শান্তাকে (ব্রহ্মচারিণী) বলো। শান্তাজীকে বলাতে ও বললো, "স্বরূপদা বৃন্দাবন থাকেন তুমি স্বরূপদাকে বলো।" মার সামনে তাই বললাম। তারপর মাকে বললাম, "আমি কিন্তু গোপালকে নাতির মতো আদর করবো। ভোগটোগ দিতে পারবো না যখন যা জুটবে তাই দেব। সম্ভব হলে ভোগ রান্না করে দেব। আর অভিষেক, প্রাণ প্রতিষ্ঠা ওসবও করতে পারবো না, তোমার হাত থেকে পেলেই আমি জানবো তার প্রাণ আছে।" মা খুব হাসলেন। পিলানী পর্ব মিটলে মার সাথে আমরা সব দিল্লী আশ্রমে গেলাম। আশ্রমের হলঘরে বেশীর ভাগ ভক্তের থাকার ব্যবস্থা হলো। খুঁটিনাটি ছোট্ট তুচ্ছ ব্যাপারে মার কিরকম দৃষ্টি তাই দেখলাম। কোথায় কে শোবে, কোথায় মাল গুছিয়ে রাখবে, মাথায় ঠান্ডা লাগবে বলে কোন জানলা বন্ধ হবে সব দেখে দেখে সকলকে বলে দিলেন। মায়ের প্রতিটি কাজে যে সৌন্দর্যবোধ থাকতো তা কোনো বড়ো শিল্পীরও আছে কিনা সন্দেহ।

তারপর মা বৃন্দাবনে গেলেন। আমি মাকে গোপালজীর কথা স্মরণ করিয়ে চিঠি দিলাম। মা স্বরূপদাকে দিয়ে পছন্দ মতো গোপাল আনিয়ে বৃন্দাবনে মার শয়নমন্দিরের জানলার উপর ৭দিন রেখেছিলেন। চিত্রাদি আমাকে সব লিখেছিল আমি ফ্রক, ইজের তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তা পরিয়ে রাখা হয়েছিল। ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৬১ সনে গোপালজী শান্তিদার (ব্যানার্জ্জী) সাথে হাওড়া এলেন। ১ ঘন্টা train late ছিল। আমরা উৎসাহ উদ্দীপনায় ছটফটিয়ে সময় কাটালাম। তারপর শান্তিদার কাছ থেকে গোপালকে নিয়ে এলাম। শান্তিদা বললেন, "আমার ১ দিন আগে আসার কথা ছিল, মা হঠাৎ বললেন তুমি ওদিন না গিয়ে ১ দিন পরে যাও, দিন ভালো আছে।" এদিকে আমার একটা বিশেষ দিনে গোপালকে বাড়ীতে আনার গোপন ইচ্ছা ছিল, তা কখনও প্রকাশ করিনি। অন্তর্যামিনী মা তাই ২৫শে ডিসেম্বর গোপালকে আমার বাড়ী পাঠালেন। গোপাল বাড়ী আসবার সঙ্গে সঙ্গে এক পরিচিত ভদ্রলোক ১ হাঁড়ি জয়নগরের মোয়া ও মিষ্টি নিয়ে হাজির অথচ তিনিও গোপালের কথা কিছু জানতেন না। গোপালের বিছানা খাট সাজ পোষাক গয়না কিনে দিলাম। যে কেউ দেখেছেন মুগ্ধ হয়ে যেতেন। স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দজী আমায় খুব স্নেহ করতেন উনি গোপাল দেখে বলেছিলেন, "এতো জীবন্ত গোপাল।" আমি বলেছিলাম, "মায়ের কাছ থেকে এসেছেন জীবন্ত তো হবেনই।"

একবার গোপালকে নিয়ে আমরা সকলে বর্ধমান গিয়েছিলাম। ওখান থেকে তারাপীঠ দর্শন করে সন্ধ্যাবেলা ফিরেছি। বাক্স থেকে তখন গোপালকে আলস্যবশে আর বের করিনি। আমার ছেলেমেয়ে ছোট। ওদের জামা কাপড় ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে দিলাম। পরদিন সকালে স্নানটান করে বাক্স থেকে গোপালকে বের করলাম দেখি মুখটা খুব ফোলা। আমি ভাবলাম চোখের ভুল; কানে ও গলায় গয়না পড়ানো নেই তাই বুঝি অমন লাগছে। সাজিয়ে গুছিয়ে খেতে দিয়েছি ছেলে মেয়ে স্বামী সকলেই পরপর বলছে গোপালের মুখটা ফোলা কেন? তারপর আমার সঙ্গে কাজের মেয়েটিও গিয়েছিল সে বলছে, "মাগো গোপালের কিন্তু রাগ হয়েছে, তাই মুখ ফুলিয়ে আছে। তুমি ভাইবোনকে পরিষ্কার করে দিয়েছো। ওকে বাক্সে বন্ধ করে রেখেছিলে তাই রাগ হয়েছে।" নিজে তো দেখেইছি পরপর সকলে এককথা বলায় আমি ভীষণ অনুতপ্ত হলাম। আদর করলাম অনেক। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার দিকে স্বাভাবিক চেহারা দেখলাম। এরপর আমি গোপালকে আর বাক্সবন্দী করি নাই। একটা ঢাকনা দেওয়া ফুটো ফুটো বেতের basket করে নিয়ে যেতাম। নিঃশ্বাস ফেলার কষ্ট হতো না। ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিলে ওকেও সঙ্গে নিতাম। রোজ স্নান করিয়ে, জামা ইজের বদলে দিয়ে পূজো করতাম। রাত্রে শয়ন দিতাম। যদি কখনোও ভুলক্রমে শোয়াতে ভুলে যেতাম আমার কিছুতেই ঘুম হতো না। মধ্য রাত্রে উঠে দেখি শোয়ানো হয় নাই। ওকে শুইয়ে গেলে আমার ঘুম হতো। ও আমাদের নয়নের মণি ছিল। বাড়ীর একটা বাচ্চা নাতির স্থান নিয়েছিল। ওর জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বর পালন করতাম। ১৮ বছর ছিলেন এর মার কোলে দিয়ে আমি প্রায় ১০/১২ বার মাকে পূজো করেছি। খাইয়ে দিয়েছি। মা যে কতো খুশী হতেন, আনন্দ প্রকাশ করতেন, আমার মাথায় পিঠে অভয় হস্ত বুলিয়ে দিতেন, তা আমি লিখে প্রকাশ করতে পারবো না। প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই ছিলেন। একবার মার কোলে গোপাল বসিয়ে মাকে পূজো করে আরতি করছি মেয়েরা আরতির হিন্দী স্তব গাইছে মা পুষ্পদিকে বললেন, "প্রেম মুরতি ভগবান ঐ গানটা গা, ওর ভালো লাগবে।" হিন্দী আমি ভাল বুঝি না। এসব পুণ্য স্মৃতি আমাকে মাঝে মাঝে মায়ের সান্নিধ্যের আনন্দ দেয়।

একবার দিল্লীতে এক মজার ঘটনা হলো। উদাসজী মায়ের স্নানের বালতীর জল ভালো গরম রাখার জন্য আমার কাছে একটা মাথা উঁচু ষ্টিলের থালা চেয়েছিলেন। কেনার পর সেটা ২ বার বদলানোর পর ভালো fit করলো। উদাসজী খুব খুশী। বললো মাকে কিছু বলো না।" মায়ের সেবার জন্য এইসব ব্রহ্মচারিণীরা

নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছেন। এদিকে গোপালের জন্মদিন বলে আমি মার জন্যে ছানার জিলিপী, রসগোল্লা, সন্দেশ সব ঠাকুর ঘরে বসে তৈরী করে নিয়ে গিয়েছি। উৎসব ২ দিন আগে হয়ে গিয়েছে মাকে ভোগ দেব বলে নিয়ে গিয়েছি। দিল্লীতে হলঘরের দোতলায় মা ছিলেন। হঠাৎ সিঁড়ির সামনে ঝটপট বেরিয়ে এলেন মা, আমাকে বললেন, "কি এনেছিস, অল্প খাইয়ে দে।" আমি এক ফোঁটা ছিড়ে মুখে দিলাম বললেন, "বাঃ খুব ভালো হয়েছে, এখন সব রেখে দে।" আশ্রমের ইন্দিরাদি আমাকে বলছেন, "তুমি এতো কষ্ট করে এসব কেন করো? মা তো কিছুই খান না, আমি হলে করতাম না।" আমি বললাম, "যেটুকু হয়, এমন কি দৃষ্টিভোগ হলেও আমি তৃপ্ত হই।" এদিকে মা হঠাৎ সিঁড়ির কোনের কাছে সেই বালতীটার দিকে তাকিয়ে উদাসজীকে বললেন, "শিগ্‌গির ঐ বালতীর ঢাকনাটা নিয়ে আয় তো।" উদাসজী ইতস্ততঃ করছেন, মা তাড়া দিচ্ছেন আমি তো ভয়ে কাঁপছি। থালাটা হাতে নিয়ে উদাসজীকে বললেন "এ থালা কোথা থেকে পেলি?" ভয়ে ভয়ে ও বললো, "বাসন্তীদি দিয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে মা খাবারগুলো ওতে সাজিয়ে দিতে বললেন ও সামান্য প্রসাদসহ আমার বাসন ফিরিয়ে দিতে বললেন। আমাকে বললেন, "তোর করা ঐ মিষ্টি আমি একজন ভালো লোককে খেতে দেব।" তারপর শুনলাম ইন্দিরা গান্ধী একটু পরে আসছেন তাই মার অতো ব্যস্ততা। আশ্রমে নিম্‌কি ইত্যাদি ভাজা হলো। আমি চলে আসছি, উদাসজী খুব দুঃখ করে বললেন, "অন্যের উচ্ছিষ্ট ঐ থালাটা মার জন্য আর ব্যবহার করতে পারবো না।" কারো কাছ থেকে কিছু চাওয়া মা একেবারে পছন্দ করতেন না অথচ কোনো বকাঝকা না করে সেটা সময় মতো বুঝিয়ে দিতেন। কিরকম অদ্ভুত লক্ষ্য ছিল যে তা না দেখছে বুঝবে না।

সন ঠিক মনে নেই। মামাবাড়ী দুর্গাপূজো হবে। স্থানাভাবের জন্য সবার যাবার মানা আছে। আমি এসব জানতাম না। দুর্গা পূজো এলে মায়ের কাছে যাবার জন্য ছটফট করতাম। তাই মাকে কাশীর ঠিকানায় চিঠি দিলাম পূজোর সময় তোমার কাছে যেতে চাই। তোমার কাছকাছি থাকার ব্যবস্থা করে দিও গো মা। পানুদা মায়ের চিঠির জবাব দিলেন, "বাসন্তী আসবে আনন্দ।" তারপর পানুদা লিখলেন কাছাকাছি থাকার জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে না। যাই হোক্ যাবো এই আনন্দ। আমার স্বামী ছেলেমেয়ে নিয়ে Dehri-on-sone. এ ভাসুরের কাছে থাকলেন। আমাকে ওঁরা কাশী পৌঁছে দিলেন। গোপাল মন্দির তখন তৈরী হচ্ছিল। তার গুহার মধ্যে আমার থাকার স্থান হলো। ঠিক মামাবাড়ীর মুখোমুখি। বাড়ীর লোকরা চিন্তিত, স্যাৎসেতে ঠাণ্ডা ঘরে অসুখ করবে বলে। আমি তো পুলকিত, ওরা ফিরে গেলে

আমি তখন বাঁচি। আমার আরাধ্যদেবীও গোপালের photo সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি। মা পরদিন নিজে এসে আমার থাকার ব্যবস্থা দেখে গেলেন। আমার দেবীর ছবি দেখে বললেন, "এতো জাগ্রত, সুন্দর, তেজস্বী।" গোপালকে আদর করলেন। মামাবাড়ী পূজো শুরু হলো। অষ্টমী পূজোর দিন মামাবাড়ী সংলগ্ন বাথরুমে স্নান সেরে ঘরে এসে একটা basket.এ মায়ের জন্য পূজোর শাড়ী, শাঁখা, সিঁদুর, ফুল, ফল ইত্যাদি ভরে রেখেছি, তখন বেশ ভোর। ভাবলাম যদি দেরী হয় আর একবার বাথরুমটা ঘুরে আসি। কাপড় চোপড় ছেড়ে মগটায় হাত দিয়ে কল খুলে দেখি এক ফোঁটা জলও নেই। তখনতো আমার মাথায় বজ্রাঘাত। পূজোর জিনিষ কতো বিচার আচার, কিন্তু তখন কিছুই করবার উপায় নেই। কাজেই ঐ হাতেই কাপড়চোপড় পড়তে হলো, মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। গঙ্গার সিঁড়ি ভীষণ খাড়া, শরীর দিচ্ছে না তবুও সোজা গঙ্গায় নেমে গেলাম। ঘরে ফিরে কাপড়চোপড় ছেড়ে মার কাছে যাব বলে স্থির করলাম। ধুঁকতে ধুঁকতে সেই সিঁড়ি ভেঙ্গে গুহার মধ্যে ঢুকতে গিয়েছি চারিদিকে মা মা শুনে দোতলায় তাকিয়ে দেখি মা দাঁড়িয়ে আছেন, মিটিমিটি হাসছেন, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন মুহূর্ত মধ্যে আমি পূর্বাপর সব কিছু শুচি অশুচি ভুলে গেলাম। বিহুলভাবে পাগলের মতো পুজোর basket টা নিয়ে মামাবাড়ীর দোতলায় ছুটলাম। মা হাসছেন বলছেন, "তুমি তো পূজো করবা বলছিলা এখন করো।" আমি বললাম, "আমার তাড়া নেই অপেক্ষা করছি। তুমি মুখ হাত ধুয়ে টুয়ে নাও।" মা বললেন, "ঠিক আছে কাপড়চোপড় ছ্যাইড়া মুখ হাত ধুইয়া আসি। তুমি বসো।" আমি তখন সম্মোহিত। সব ভুলে গিয়েছি। গঙ্গায় যে ওভাবে গিয়েছি তাও মনে নেই। মা এসে আমায় ডাকলেন। বললেন ধুতিটার উপর শাড়ীটা পরবো? আমি বললাম শাড়ীটাই যদি আগে পরো খুশী হবো। মা তাই করলেন। খুব তৃপ্তভাবে মা সব গ্রহণ করলেন সামান্য একটু ফলমিষ্টি খেলেন। বললেন, "তুমি খুশী হইছো তো?" আমি ধন্য হয়ে গেলাম।

একতলার বারান্দায় দুর্গাপূজো হচ্ছে। মা পা ছড়িয়ে একটা stool.এ গিয়ে বসলেন। পূজো হচ্ছে। একটার পর একটা শাড়ী মাকে পরানো হচ্ছে। কুমারী পূজো হবে। মামীমা মাকে পূজো করছেন। কলাটা হাতে নিয়েছেন মা তাড়াহুড়া করে সবটা খেয়ে নিলেন। কি ব্যস্ততা। কি সুন্দর ভাব। ত্রিপুরারী (চক্রবর্তী) দাদার সঙ্গে নানা রঙ্গরস করছেন। এর মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঠ্যালায় একটা গঙ্গাজল ভরা কলসী উপুড় হয়ে চারিদিকে জলে ভরে গেল। ওরা তো জল মোছার জন্য ব্যস্ত। মা মিটিমিটি হাসি নিয়ে দুষ্টু দুষ্টু মুখে আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন

আর বলছেন, "গঙ্গাজলে সব শুদ্ধ বুঝলা না।" তিনবার কথাটা বললেন। তখন আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। আমার কি অবস্থা হয়েছিল স্মরণে এলো, অন্যরা কেউ কিছু বুঝলো না। একটা নিশ্চিন্তির নিঃশ্বাস পড়লো। মা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে বললেন, "এই শাড়ীটা তুমি নাও।" আশ্চর্য্য ৩/৪ টা শাড়ী পরা। আমারটা সব চাইতে নীচে। কি কায়দায় সেটা মুহুর্তের মধ্যে খুললেন ভাবলে অবাক লাগে। সিল্ক শাড়ীও নয়। চওড়া লাল পাড় তাঁতের শাড়ী। অবাক্ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। অঘটন ঘটন পটিয়সী এই মা। অন্তরের সব দ্বন্দ্বব্যথা এক মুহুর্তে দূর করে দেন। তবে চাওয়াটা যদি সত্যি সত্যি আন্তরিক হয় তবেই ফলপ্রসূ হয়। সাধারণ জীব আমরা, সর্বদা চাওয়ার মতো তো চাইতে পারি না। স্বর্গীয় পরিমণ্ডলে কখনো কখনো তা সিদ্ধ হয়। ত্রিপুরারীদা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "মা তুমি বাসন্তীকে চেনো?" ত্রিপুরারীদা সম্পর্কে আমার ভগ্নীপতি হতেন। ঠাট্টা করেছিলেন। মা বললেন, "চিনি, চিনি, খুব চিনি।" বিজয়াদশমীর পরদিন ফিরলাম। গোপালকে মা কতো আদর করলেন। চোখের জলে বুক ভেসে গেল। "কান্দো ক্যান" বলে সান্ত্বনা দিলেন। ওতো আমার প্রাপ্তির আনন্দের কান্না। হৃদয়ভরা আনন্দ নিয়ে সেই চিরাচরিত সংসারে ফিরলাম।

মায়ের স্পর্শের গুণে গোপালকে সকলে সোনার গোপাল বলে ভাবতো।

১৮ বছর পর জগন্নাথের স্নানযাত্রার দিন দুর্যোগ নেমে এলো। ১৯৭৯ সন স্নানযাত্রার রাত্রে পূর্ণিমার মধ্যে চোর জানলার শিক ফাঁক করে একটা বাচ্চা ছেলেকে ঢুকিয়ে দিয়ে সিংহাসন সহ গোপাল তুলে নিয়ে গেল। পুলিশ বললো, "বাচ্চা ছেলে না ঢুকলে এই ফাঁকে বড়ো কেউ ঢুকতে বা বেরোতে পারতো না।" প্রতিটা ঘর খোলা ছিল। কোনো ঘর থেকে কিছুই নেয় নাই। ভোরে পূজোর ঘরে ঢুকে গোপাল নেই দেখে বাড়ীতে হাহাকার পড়ে গেল। ছেলেবৌ আমরা দু'জন পাগলের মতো কাঁদছি। এতদিনের পূজিত প্রাণের গোপাল নিয়ে চোর চলে গেল। মা তখন পুরীতে। এ খবর পেয়ে প্রচণ্ড ঝামেলা করে টিকিট পেয়ে আমার বোন আগমনী আমাকে পুরী নিয়ে গেল। অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে মা সব ঘটনা শুনলেন। কতো সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, "ওদেশে শুনেছি হাজার টাকা জমা রাখে কোনো জায়গায়। চোর জিনিষ দিয়ে টাকা নিয়ে যায়। এ শরীরটার এটা শোনা কথা।" আমি বললাম, "পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, কলকাতায় এ সম্ভব হবে না। তবে আমি হাজার টাকা আলাদা করে রেখে দেবো যা হবার হবে।" তারপর মা একটু ভেবে বললেন, "দ্যাখ সোনা ভাইব্যা গলায়ে ফেলছে কিনা।" আমাকে বললেন, "তুই কাঁদিস না

এক কাজ কর। গয়নাগুলো গলাইয়া ছোট্ট একটা গোপাল বানাইয়া পূজা করিস।" আমি বললাম, "তা আমি করবো না। তুমি ঐ গোপালকে আনিয়ে দাও।" কিছুক্ষণ পর বললেন, "গোপাল এখন তো বড়ো হইছে, রাধাকৃষ্ণ দি, তুই পূজা করিস।" আমি বললাম, "ঐ গোপাল ফিরে এলে তাকে পূজো করবো, অন্য কিছু চাই না।" পরোপকারী রাজার গল্পটা শোনালেন।

মোট কথা আমি কিসে শান্তি পাবো, আমার পূজোয়, সেবায় যে কোনো প্রত্যব্যয় হয়নি মা বারবার আমাকে তা বোঝালেন। আমার মাথায় বুকে শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিলেন কতো আদর করলেন। গোপাল আর এলেন না। তার দু'মাস পর হরিদ্বার গিয়েছি। হঠাৎ খবর পেলাম চোর ধরা পড়েছে। মা শুনেই বললেন, "গোপাল পাইছে নাকি?" পুলিশ যে কি করলো মাই জানেন। শুনলাম একটা বাচ্চা ছেলে ধরে আমাদের ঘরে নিয়ে এলো। সে বললো, "আমি জানল্‌া দিয়ে নীচে দিয়েছি, চারজন ছিল," এই পর্যন্ত। গোপাল পাওয়া গেল না।

মা বললেন, "তোর ১৮ বছরের পূজা বৃথা যায়নি। তুই মনে শান্তি রাখ।" ফিরে এলাম কলকাতায়। তারপর আমার নাত্‌নীর মুখে ভাত উপলক্ষ্যে ১৯৮০ সনের জুলাই মাসে কনখলে গেলাম ও সেই হাজার টাকা ভাণ্ডারা দিতে বললাম এবং মাকে পূর্ণিমার রাত্রে গোপালরূপে সাজিয়ে পূজো করলাম। গোপালের ব্যবহৃত সমস্ত জিনিষ মাকে পূজো করে দিলাম। কিছু একটা রাখার জন্য মা বারবার বললেন। আমি বললাম, "গোপালকে গোপালের জিনিষ দিলাম, ও আর আমি রাখবো না।" মা বললেন, "আচ্ছা একটা ভালো কাজে লাগিয়ে দেব। তোর মনের জ্বালা নেভাবার জন্য এই শরীরটা দু'ঘন্টা বসে তোর পূজা গ্রহণ করলো।" গোপালের একটা ফটো ছিলো মা সেটা কোলে করে বসে পূজো গ্রহণ করেছিলেন বললেন, "এই photo-টায় আগে যেভাবে পূজা করতিস তাই কোরবি।" এরপর আমার প্রাণের জ্বালা সত্যিই অনেক কমে গেল। মনটা শান্ত হলো। তবে অভাব বোধটা থেকে গেলে। বিগ্রহ যে এতো নিগ্রহ দেবেন তা আগে ভাবিনি। ত্রিকালদর্শিনী মা আমাকে এইভাবে শান্ত করলেন।

জ্ঞানদায়িনী, কৃপাময়ী মায়ের অনন্তলীলার একবিন্দু পরিবেশন করলাম। কারো এ কাহিনী শুনে ভালো লাগলে এ লেখার সার্থকতা। জয় মা।

আনন্দ বার্ত্তা বর্ষ ৪১, জুলাই, ১৯৯৪, সংখ্যা ৩

শ্রীশ্রী মায়ের স্বরূপ প্রকাশ

সেবার নৈমিষারণ্যে দুর্গা পূজোয় শ্রীশ্রীমার কাছে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার সময় মাকে বললাম — মা সংযম সপ্তাহে যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু শারীরিক ও সাংসারিক কারণে বোধ হয় যাওয়া হবে না। মা যেন অমৃত ঢেলে দিয়ে বললেন — চেষ্টা করো মা'ই বলে দিলেন দিল্লীর মাতৃভক্ত পঙ্কজদার ছেলে ডাঃ দুর্গাদাস সেনকে দেখাতে। দিল্লী ফিরে তাঁকে দেখালাম, বললেন — বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন — আমি সংযম করতে বলতে পারছি না। আমি মার কথা বলায় বললেন — মাকে জিজ্ঞাসা না করে সংযম করবেন না। আমার স্বামীও একই সর্তে আমাকে যাবার অনুমতি দিলেন।

১২ই নভেম্বর কনখলে সুরত গিরি মহারাজের আশ্রমে দুর্বল শরীর নিয়ে বিকেলে মার কাছে পৌঁছলাম। মাকে প্রণাম করে ডাক্তারের নির্দেশ বলাতে মা বললেন - B class করো। ওষুধ খাও, তবে প্রথম দিন তো শুধু গঙ্গাজল, আচ্ছা B class ই করো।' মনে দারুণ শক্তি ফিরে এলো। মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পরদিন ১৩ই নভেম্বর থেকে সংযম সপ্তাহ শুরু করলাম। বিরাট আশ্রম। করুণারূপিণী শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর সান্নিধ্যে, সাধু মহাত্মাদের পুণ্য উপস্থিতিতে, চিরপূত আধ্যাত্মিকভাবের আবেশবিহ্বল কনখলের আকাশ বাতাস কেমন একটা আনন্দের হিল্লোল বহন করে আনছিল তা ভক্তদের আনন্দোজ্বল শান্তমুখের দিকে তাকিয়ে প্রত্যেকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলেন। সাধুমহাত্মাগণ তাঁদের, ভাষণে যখন পূত কনখলের স্থান মাহাত্ম্য ব্যক্ত করছিলেন তখন নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে সত্যিই পুলকিত হচ্ছিলাম। মা দশভূজার মত সাধুমহাত্মা ও অতিথিদের থাকা, খাওয়া, আদর যত্নের পূর্ণাঙ্গীন ব্যবস্থা ইঙ্গিতে করে দিচ্ছেন। গীতার 'সূত্রে মণি গণা ইব' শ্লোকটি আমার মনে পড়ছিল। মণিগুলো সুন্দরভাবে গাঁথা আছে কেবল 'মা' রূপিণী সূত্রটি তাদের ধারণ করে আছেন বলেই তো। সাধু মহাত্মাদের সাথে মায়ের যে ব্যবহার তা দেখবার মত। প্রতিটি ভক্তের শিক্ষণীয় বিষয়। মা তাঁদের ছোট্ট মেয়ে সেজে বাবাদের উপযুক্ত সম্মান কিভাবে দেবেন তা যেন ভেবে পাচ্ছেন না। যাঁর সামান্য একটু হাসি, দৃষ্টিপাত দেখার জন্য মহাত্মারা ব্যাকুল তিনি তাঁদের কাছে নিজের মহিমা সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন রেখে ছোট্ট মেয়েটি সেজে বসে থাকেন। মায়ের সেই কিশোরী রূপ ভক্তমনকে আরো আকর্ষণ করে। বাড়ীতে বসে সংযম সপ্তাহের নিয়ম হিসাবে অন্ততঃ পক্ষে পাঁচ হাজার জপ করতে প্রাণ যেন

বেড়িয়ে যায়, হাত ব্যথা হয়ে যায়। করতে হয় করি। আর এবারকার সংযম সপ্তাহে মালা করতে হয়নি, মালাই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে। সৎসঙ্গে বসলে আপনা থেকে জপ হয়ে যেতো, চেষ্টা করে করতে হতো না। কোন কষ্ট বা ক্লান্তি বোধ হতো না। শান্ত গম্ভীর আধ্যাত্মিক ভাবে প্লাবিত আকাশ বাতাস কি জানি কোন অজানা রহস্য জড়িত থাকতো। আবিষ্টের মত একটার পর একটা দিন কেটে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণাও একেবারে বিব্রত করে নাই। পরশমনির ছোঁয়ায় লোহাও সোনা হয় শুনেছি। আমাদের মত জন্মজন্মান্তরের শিকড় গাড়া সংস্কারের জীবও সেই মাতৃরূপিণী পরশমণির ছোঁয়ায় জড়তাহীন হয়ে সৎসঙ্গ উপভোগ করতে লাগল। কাজেই কনখলের স্থান-মাহাত্ম্য যে কতোখানি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছিলাম।

সংযম সপ্তাহের ষষ্ঠদিন ১৮ই নভেম্বর মাতৃ সৎসঙ্গের সময় এক ভক্ত মাকে প্রশ্ন করে—মা কখনও মালা জপ করেছেন কিনা। শুনে মায়ের সে কি মধুর হাসি। যুক্ত করে মহাত্মাদের বলছেন — বাবা তবে কি সত্যি কথা বলে দেবো? দোষ হবে না তো? এই ছোট মেয়েটাকে তো তোমরা লেখাপড়া শেখাও নাই, উৎপটাং বলে এই মেয়েটা। সত্যি কথাটা বলেই ফেলি।' এই বলে স্থির গম্ভীর সুউচ্চ স্বরে মা বললেন— "তা যদি বল, তবে এই যেসব জায়গায় সব হাতে মালা জপছে, তা এই শরীরটাই জপছে।"

এত বড় কথা, এইভাবে নিজমুখে স্ব স্বরূপের পরিচয় মা সচরাচর দেন না। সর্বদা প্রচ্ছন্নভাবেই চলতে চেষ্টা করেন। এমনি ভাবে মাকে স্বরূপতত্ব বলতে দেখে মহাত্মারাও স্তব্ধ, ভক্তরা বিহ্বল। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখে অর্জুনের মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল ভক্তদের অবস্থাও প্রায় তাই। তখন মনে হচ্ছিল আমরা এই আগুন নিয়ে কিভাবে খেলা করছি। এ আগুনের দহন নাই, পাবনীশক্তিই আমাদের উদ্ধার করছে। নরদেহী মা.হিসেবে এঁর সঙ্গে আমরা কতো নিকটতম সাধারণভাবে মেলামেশা করছি। বিশ্বনিয়ন্তা সর্বব্যাপী আজ করুণারূপিণী জননীরূপে আমাদের সামান্য ভক্তি ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে আছেন।

সৎসঙ্গ হলে একটা আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। ভক্তদের শরীর কন্টকিত হয়ে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত, ব্যস্ আবার সাধারণ হাসি কথায় জননী তাঁর মোহিনী মায়া বিস্তার করে সেই পরম রহস্যের উপর তুলি বুলিয়ে সকলকে জাগতিক অবস্থায় নিয়ে এলেন। সে এক অপূর্ব যাদুকরের অদ্ভুত খেলা।

সে বছরের সংযম সপ্তাহ আমার জীবনে চির অক্ষয় অব্যয় রূপে জাগরিত হয়ে আছে। জয় মা।

আনন্দবার্তা বর্ষ ৩৪, জানুয়ারী, ১৯৮৭, সংখ্যা ১

শ্রী শ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে
শ্রীমৎ শিশিরকুমার ব্রহ্মচারীজীকে লিখিত পত্র

শিশির ব্রহ্মচারীজীঃ নিম্বার্ক আশ্রমের দাস বাবাজির শিষ্য। সুদর্শন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। উনি আনন্দময়ী মায়ের কাছেও কিছুদিন ছিলেন। উনি শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত। আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসতেন। আমাকে লিখতে বলতেন। আমি সাহস করি নাই। মুদ্রিত চিঠিটি ওঁকে এমনি লিখেছিলাম উনি তা সুদর্শন পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। তারপর আনন্দবার্তায় পুনঃমুদ্রিত হয়। জয় মা।

পরম পূজনীয়েষু শিশিরদা,

আপনি আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। মাতৃকৃপা লাভের পর প্রায় প্রতি বছর দুর্গাপূজায় মায়ের কাছে যেতাম। সেই পূত সান্নিধ্য প্রাণভরে উপভোগ করে আসতাম। এমনও হয়েছে মা নিজে থেকে পূজোয় যেতে বলেছেন। তাই আজ মার কথা বলতে খুব ইচ্ছা করছে। এসব কথা আপনি বার বার শুনতে চান বলে আপনাকেই লিখতে বসলাম।

জানেন তো কতো অনুগ্রহ কৃপা স্নেহ তিনি এই দীর্ঘ ২৪ বৎসর ধরে আমায় করে এসেছেন। বর্তমানে ঠিক যেদিন মা তাঁর প্রাকৃত লীলাবিলাস থেকে বিদায় নিয়ে অব্যক্তে লীন হয়ে গেলেন, সেইদিন থেকেই আমি শয্যাগত। তারপর আজ প্রথম চিঠি লিখছি। মা যে কখনও তাঁর নরশরীর ছেড়ে চলে যাবেন (এ সত্যটুকু জানলেও) কখনও ভাবতে চেষ্টা করিনি। তাই হঠাৎ ২৬/৮/৮২ তারিখ থেকে আমার সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক অস্থিরতা বোধ করেছি। কি একটা ক্ষতি আসছে বুঝতে পারছি, অথচ কি যে তা জানি না। ২৭ তারিখ সন্ধ্যাবেলা ডাক্তার দেখে গেলেন। আমি শয্যাশায়ী। ২৮/৮/৮২ ভোরে ঐ ভয়াবহ দুঃসংবাদ। কান্নায় আরো ভেঙে পড়লাম। তবে এই শয্যাগত অবস্থায় বুঝছি এখন এভাবে একলা থাকাটাই আমার মানসিক সাম্যের জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে করে দিয়েছেন। তাই বুঝতে পারছি তাঁর অনুগ্রহ নিগ্রহ দু'রকম কৃপাই আমাদের ঠিক সময়মতো দিচ্ছেন। আমি মাকে ভালবাসি কোন বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নয়। মা

আমার নিজের প্রাণের মা। আমার যে ইষ্ট তিনিই মাতৃরূপে আমার কাছে প্রকাশিত এই দৃঢ় ধারণায় তাঁর সাথে আমার সর্বব্যাপারে যোগাযোগ হয়েছে। তাই আপনার আদেশ অনুযায়ী সত্য অনুভব আপনাদের শাস্ত্রজ্ঞের অনুভূতি নিয়ে, সুদর্শন পত্রিকায় লেখার আমার ক্ষমতা বা সাহস কোনোটাই নাই। ঘরোয়া মা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যবহার চলতো। আমি মাকে যে চিঠি লিখতাম তাতে "আদরের মামণি" বা "মা জননী" বলে সম্বোধন করতাম। শেষে লিখতাম "ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ও অনেক আদর নিও।" জীবনের সুখ, আনন্দ, ব্যথা, বেদনা, সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন সব ব্যাপারে ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। নয় তো চিঠি দিতাম। উত্তর পেয়েছি প্রতিটা চিঠির। বিষয়বস্তু "একমাত্র ভগবৎ স্মরণ।" অথচ সেই জবাব দুটিই আমার জীবনের Electric Charge ছিল। একদিন দিল্লীর আশ্রমে গিয়ে মায়ের ফটোতে মুখটা কেমন ফোলা ফোলা দেখলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাড়ীতে এসে মাকে চিঠি দিলাম, উত্তরে মা জানালেন "তুমি যা দেখেছো ঠিক, এ শরীরটা এলোমেলো যাচ্ছে।" অনেক চিঠি আছে পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলে দেখাবো। সর্বদা মায়ের সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখতাম। অনেক সময় জাগ্রত স্বপ্নের মতো হতো। একবার বিন্ধ্যাচলে মাকে ছেড়ে চলে আসার সময় খুব কাঁদছি, ছেলে হেসে হেসে বলছে "মা নাকি সর্বদা তোমায় স্বপ্ন দেখে।" তখন মা বললেন, "ও এ শরীরটার কথা সর্বদা ভাবে কিনা তাই দেখে।" আমি বললাম "মা কতো সময় কতো কি ভাবি স্বপ্নে দেখার জন্য, তা তো হয় না।" মা হাসলেন। বললেন, "গুরু ইষ্টের স্বপ্ন দেখা খুব ভালো জাগ্রতে দেখার যা ফল স্বপ্নে তার অর্দ্ধেক পাওয়া।" শিশিরদা, এ আমার জীবনের কতো বড়ো আশীর্বাদ বলুন তো? ভালো স্বপ্ন দেখলে সেই প্রসন্নতাটা বজায় রাখার জন্য বলেছিলেন — তারপর আমাকে আশীর্বাদস্বরূপ যে গাঁদার ফুলের মালাটা পরিয়ে দিয়েছিলেন তার থেকে একটা ফুল খুলে রেখে বললেন, "এটা আমার কাছে থাক।" মায়ের এ সব আশীর্বাদ আমার জীবনের চরম ও পরম পাথেয়। যখনই বলেছি, "মা কিছু হচ্ছে না, ধ্যান জপ কিছু না। শুধু তোমাকে ভালবাসি। সদ্‌গ্রন্থ পড়তে ভালো লাগে। তোমার জন্য কান্না পায়।" মা বলতেন, "হচ্ছে, হচ্ছে, হবে। এই তো তাঁর জন্য চোখের জল ফেলা একি কম কথা? ইত্যাদি অনেক সান্ত্বনা বাক্য। শাস্ত্রপাঠ যখন শুনি, সেই ক্ষুরসাধ্যারা নিশিতা ..... দুর্গম পথ ইত্যাদি তখন আবার ভয় হয়। কিন্তু মাতৃসন্নিধানে গেলে তখন কোন ভয় থাকতো না। মনে হয় আমার ডিঙ্গি নৌকা যখন ঐ বড়ো জাহাজে বাঁধা পড়েছে তখন আমার অতো ভাবনা করে কি হবে?

একবার রাজগীরে একটা বাতাসা নিয়ে মায়ের মুখে ছুঁইয়ে প্রসাদ করিয়ে আনবো ভেবেছি। দিদিকে ভীষণ ভয় পেতাম। মাকে ভয় পেতাম না। দিদি দেখতে পেয়ে বকতে এলেন। আমি ভয়ে সরে এলাম। বললাম, "খাওয়াচ্ছি না, ছুঁইয়ে প্রসাদ করে নেব।" মা হঠাৎ "আন তো" বলে মুখ বাড়ালেন। যেই ঠোঁটের কাছে লাগিয়েছি মা খপ্ করে পুরো বাতাসটা খেয়ে বললেন, "আমি সবটাই খাব।" তখন তাঁর কি অদ্ভুত হাসি। আমি আবার একটা বাতাসা ছুঁইয়ে প্রসাদ করে আনলাম।

আমার gall bladder. এ stone হয়েছে। কানপুরে ভাগবত সপ্তাহ হচ্ছে 1972, December মাসে। ওখানে মাতৃদর্শন করে কাকে দিয়ে Operation করাবো বলাতে মা প্রথমেই বললেন, "দিল্লীর Dr. Sen তো উদাসকে করেছিল' আমি বুঝলাম মা Dr. Sen. কে দিয়ে করাতেই ইঙ্গিত করছেন। আমরা তো তখন দিল্লীতে ছিলাম। এদিকে Dr. Sen বুড়ো হয়েছেন বলে আমার স্বামীর সংশয়। অনেক টাকা খরচ হবে বলে আমার ভাবনা। মনে মনে স্বামীরও তাই। কারণ আমরা তখন Govt. Hospital. এ free পেতাম। মা মনের কথা তো সব বোঝেন বললেন, "এ শরীরটা এসব ব্যাপারে কিছু বলে না, বাবা যা ভালো বোঝ তাই করবে।" আমাকে রাত্রে নামযজ্ঞে থাকতে মানা করলেন। বললেন, "তোমার শরীর তো ভালো না, তুমি রাত্রে থেকো না, বিশ্রাম করো।" আমরা ডাকবাংলাতে ফিরে গেলাম। পরদিন সকালে গেলাম। বিকেলে যখন নামযজ্ঞ শেষ হবে সে সময় এক অপূর্ব অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম। দিদির বইতে এসব পড়েছিলাম। ছেলেদের কীর্তন চলছিলো, বীরেনদা lead করছিলেন। মা স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে বললেন, "বাবা আমি একটু ঘুরি।" স্বামীজী হেসে বললেন, "আচ্ছা মা"। শিশিরদা সে এক অদ্ভূত ব্যাপার। মায়ের অতোবড়ো শরীরটা dias থেকে একটা ছোট্ট বাচ্চার মতো কীর্তনের মেঝেতে ঝাঁপিয়ে পড়লো — পাতা যেভাবে উড়ে যায় সেভাবে সারা নামযজ্ঞের মঞ্চটা নিমেষের মধ্যে প্রদক্ষিণ করলো। শোয়া অবস্থায় অথচ দেহটা মাটিতে লাগছে না। আমি অতি নিকটে বসেছিলাম। চোখের পলকে এ ঘটনা ঘটে গেলো। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করতেই অখণ্ডানন্দ স্বামীজী তাড়াতাড়ি উঠে হাতজোড় করে মায়ের পেছনে প্রদক্ষিণ শুরু করলেন। ছেলেরা যারা কীর্তন করছিলেন বেশীর ভাগই এ দৃশ্য দেখতে পান নাই। আমার স্বামীও ছিলেন, তিনিও দেখেন নাই। যারা দেখেছেন সব আনন্দে আত্মহারা। সে দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। দিদির বইতে পড়ে আমার বড় দেখার সাথ হয়েছিল, একদিন স্বপ্নে দেখেছিলাম।

সেই সাধ মা আমার পূর্ণ করলেন। তারপর শুনুন, কীর্তন দারুণ জমে সেখানে অভিনব ভাবগম্ভীর জমাট ভাব হলো। সেদিনকার সে স্বর্গীয় আনন্দ যাঁরা উপভোগ করেছেন তাঁরাই ধন্য, লেখনী দ্বারা তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। লোক খুব বেশী ছিল না। যাই হোক কীর্তন শেষে মা ফিরে চলেছেন। আমি ও দু'চারজন সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। আমি তখন অসুস্থ, তাই আমার সাতখুন মাপ ছিল। সঙ্গে যেতে বাধা পাই নাই। মায়ের মুখ চোখ লাল। জ্যোতির্ময়ী সে মূর্তি। ধীরে ধীরে চলেছেন, পা যেন এগোয় না। অতি আস্তে আধো আধো ভাবে কথা বেরোচ্ছে। আমি বললাম খুব সুন্দর, খুব ভাল লাগলো। মা তার উত্তর দিচ্ছেন। তারপর একটা hall ঘরে বসতে বসতে আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, "এ শরীরটা টাকা পয়সা কিছু জানে না, জানে প্রাণটা থাকলে সব হয়।" এমন সময় আমার স্বামী ও অনেকেই এসে হাজির হলেন। তখন বেশ একটু জোরে ঐ কথা আবার বললেন। তারপর আমরা স্বামীজীকে সব কথা বললাম। পরমানন্দ স্বামীজী বললেন, "তবে Dr. Sen. কে দিয়েই করো।" আমি দিল্লী ফিরে গিয়ে Dr. Sen কে সব বললাম। দিল্লীতে নামযজ্ঞে মায়ের আসার কথা আছে। ঐসময় Operation করবো তাও বললাম — মাকে একখানা চিঠি দিলাম। লিখলাম, " তোমার পবিত্র উপস্থিতিতে Dr. Sen. এর কাছে Operation করবো স্থির করেছি। তখন নামযজ্ঞ হবে, তোমার উপস্থিতিতে আকাশ বাতাস পবিত্র থাকবে, আমার কপালে যা হয় তখন হবে। তবে তুমি যদি কৃপা করে আমাকে একবার দর্শন দাও তো ধন্য হবে আমার জীবন।" ব্যস্ আমার কর্তব্য শেষ। 9th January 1973 Sen's Nursing Home. Delhi. তে আমার gallbladder operation হলো। মা পরদিন 10.1.73 সদলবলে আমাকে দেখতে এলেন। নাকে-পেটে tube, দুই হাতে saline, আমি তো pethedrine Injection নিয়ে পড়ে আছি। সত্যি শিশিরদা, ঐ যে কষ্ট তা কিন্তু আমি অনুভব করি নাই। অস্বস্তি ছিল, কষ্ট বুঝি নাই। আমি নাকি মাঝে মাঝে ডাক্তারদের বলেছি, "মা বিকেলে আসবেন, আমাকে ঘুমের ওষুধ দেবেন না।" মা সন্ধ্যার দিকে এলেন। এসেই Dr. Sen. কে বললেন, "বাবা এদের কিন্তু এই শরীরটা পাঠিয়েছে।" অথচ তখন বলেছিলেন, "বাবা যা ভালো বোঝে করুক, এ শরীরটা এসব জানে না।" কাজেই মার ইঙ্গিত বোঝা ভয়ানক শক্ত ব্যাপার। আমাকে দেখে ফুলের মালা ছুঁইয়ে দিলেন। ছেলেকে বললেন, মালাটা bed. এ ঝুলিয়ে দিতে। নিজের হাতে আবার ঠিক করে দিলেন। আমার মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। কতো সান্ত্বনা দিলেন। আশীর্বাদ করে প্রসাদী ফল দিতে দিলেন, ছেলে তা আমাকে ডিঙিয়ে অর্থাৎ bed এর অন্যদিক থেকে হাত বাড়িয়ে নিল। মা

বললেন, "ডিঙায়ে নিলি।" ওরা বললো, "মা কি হবে?" মা বললেন, "ওভাবে নিতে হয় না।" আমার স্বামী আবার ফল দিলেন, মা প্রসাদী করে ওদের দিলেন। এবার ওরা সামনে থেকে নিল। প্রারব্ধ কর্ম খন্ডন তো হয় না। তাই আমার stitch কাটার আগের দিন ভেতরে burst করে গেল। আবার operation হলে ইত্যাদি অনেক ব্যাপার। মা সর্বদা চিঠি দিচ্ছেন। ধৈর্য্য ধরে সব সহ্য করতে লিখছেন। এসব সুখ-স্মৃতি চারণ আমার জীবনের সঞ্চয়।

আমি যখন মাকে পূজো করে সিঁদুর বা চন্দনের টিপ পরাতাম মা খুব আস্তে আস্তে আমায় বলতেন, "ভ্রুযুগল মধ্যে দে।" আমার কেমন একটা শিহরণ হতো। যখন যেরূপে পূজো করতে চেয়েছি সানন্দে তা অনুমতি দিয়েছেন এবং পূজো গ্রহণ করেছেন। প্রায়ই বলতেন, "তুমি খুশী হয়েছো তো?" এ করুণা আমি কোথায় পাবো? দু'বার আমার বাড়ীতে এসেছেন — আমি একবার মাকে লিখেছিলাম, "আমি প্যাণ্ডেল করতে পারবো না, খোলা নীল আকাশ হবে তোমার চন্দ্রাতপ। বৃষ্টি যেন হয় না।" মা উত্তরে লিখেছেন, "উহার ভাব সুন্দর।" চিঠিটা আছে। শিশিরদা কি বলবো মা এলেন সন্ধ্যাবেলা আমার বাড়ীতে। চতুর্দিকে বৃষ্টি, আসার আগে আমার বাড়ীতে ইল্‌শেগুঁড়ি বৃষ্টি। এসে মা বলেছিলেন, "শরীরটা এলোমেলো, ছাদে যাব না।" সে অনেক ঘটনা, যাই হোক, মা যখন এলেন পাড়ার চতুর্দিকে বৃষ্টি— আমার বাড়ীতে বৃষ্টি নেই। যারা এলো সবারই শাড়ী ভেজা। ১৯৫৮ সনে প্রথম মায়ের কৃপা পাবার পর মা বলেছিলেন "এই শরীরটা সব সময় তোমার সাথে সাথে আছে।" আমি সেটা একটা কথার কথা ভেবেছিলাম। পরবর্তী জীবনে আমি প্রতি পদক্ষেপে সেটা টের পেতাম এবং মাকে তা বলতাম, "সত্যিই তো তাই, আমি তোমাকে যতোটা ভালবাসি তুমি তার চাইতে আমাকে অনেক ভালবাসো।" মা হাসতেন মাথায় শ্রীহস্ত বুলিয়ে দিতেন।

আমি ছেলেবেলা থেকে জগন্নাথদেবকে ভাইফোঁটা দিতাম। সেই ফোঁটা মায়ের চিন্ময় দেহে মা তিন-চার বার নিয়েছেন আমার জীবন সার্থক করে। সে সব বিস্তারিত লেখার ক্ষমতা আমার আর এখন নেই।

একটা অদ্ভুত কথা আমাকে তিন-চার বার বলেছেন। পূজো করে সামান্য কিছু কাপড় ইত্যাদি যা দিয়েছি বলতেন, "তুমি কতো আমাকে দাও, আরও দিবা।" একথার মানে আজ পর্যন্ত আমি বুঝি নাই। কারণ লোকেরা রাশি রাশি মহার্ঘ্য জিনিষ দিয়ে মায়ের পূজো করতো। আমি সামান্য শাঁখা, সিঁদুর, শাড়ী, ফুল, ফল

দিতাম। তবু যখন বলতেন আমি ভীষণ লজ্জা পেতাম। আমার স্বামী, ছেলে-মেয়ে বৌ সকলের দীক্ষাই মা নানাভাবে দিয়েছেন। একবার নৈমিষারণ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দজী ভাগবত পরায়ণ করছেন। আমি তখন নতুন দিল্লীতে গিয়েছি। মার কাছে তিন দিনের জন্য যাব। রওনা হবার দিন মেয়ের প্রবল জ্বর এলো। তখন খুব ডেঙ্গুজ্বর হচ্ছিলো। কি করি চিন্তায় অস্থির। যাই হোক শেষ পর্যন্ত বিরাট চিন্তা নিয়েই মার কাছে পৌঁছালাম। মা দেখেই বললেন 'কাল তোকে দূর থেকে দেখেছি।' অন্যদের বললেন, "তোরাও সব এসে পড়েছিস যেকোন tent এ ঢুকে পড়।" তিনদিন পর দিল্লীতে ফিরে এসে শুনলাম মেয়ের জ্বর সেই রাত্রেই ভাল হয়ে গেছে। সে আমাকে নিতে station এ এসেছে। এই হল বিশ্বতঃ চক্ষু মা।

শিশিরদা একটা ভীষণ মুশকিল কি জানেন, এতো personal কথা আছে যে সেটা প্রকাশ করা যায় না। তাতে অহংটারই বিজ্ঞাপন হয়। অথচ আমি আমি আমি ছাড়া লেখাও যায় না। এজন্য আপনার অনুরোধ সত্ত্বেও আমি কোনদিন কিছু লিখিনি। পুরীতে রথযাত্রায় একটা ঘটনা ঘটেছিল সেটা সম্ভব হলে লিখবো। সেটা ভালো মনে করলে তখন ছাপাবেন। আমি শাস্ত্রপাঠ অনেক শুনেছি— সদ্‌গ্রন্থও খুব পড়ি। কিন্তু ধ্যানধারণায় সে সব কোন কার্যকরী হয় নাই — আর আমি সাহিত্যিকাও নই। নিতান্ত ব্যক্তিগত কিছু ঘটনা আপনি বার বার জানতে চাচ্ছেন তাই লিখলাম।

এখনও traction নিচ্ছি। হাতে খুব ব্যথা। শরীরটা বড়ো ভেঙে গিয়েছে। মায়ের আশীর্বাদে শেষটা চলে ফিরে বেড়াতে পারলেই সব রক্ষা।

আপনার শরীর এখন কেমন আছে। আপনারা শরীরের থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন বলে সব সহ্য করেন। আমার তো অত উন্নতি হয় নাই। সময় সময় তাই মুষড়ে পড়ি। তবে মা আছেন এই ভরসা।

আনন্দ বার্তা বর্ষ ১, জানুয়ারী ১৯৯৪, সংখ্যা ১

করুণা পাথার জননী আমার

জগৎজননী যখন সাংসারিক মায়ের মতো ধরা দেন, তখন পরিতৃপ্ত স্নিগ্ধতায় প্রাণমন জুড়িয়ে দেন। মায়ের সঙ্গে আমার জাগতিক যোগাযোগ ১৯৫৮ সন থেকে। প্রথম দর্শনেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি তাঁর কৃপা সমুদ্রে। আমার অন্তরের বিগ্রহ অনুগ্রহরূপে মাতৃমূর্তিতে আমার কাছে ধরা দেন অপূর্ব স্নেহ করুণায়। তাই মাকে অন্তরের সব কিছু জানাতে আমার কখনও দ্বিধাবোধ হয় না।

১৯৭৮ সনের মার্চ মাসে আমার স্বামী সরকারী কার্যোপলক্ষ্যে গৌহাটী (আসাম) গেলেন। কামাখ্যা পাহাড়ে একটি কুমারী পূজো করবো অভিপ্রায়ে আমিও সঙ্গে গেলাম। মাকে একখানি চিঠি দিয়ে গেলাম, "তুমি পূজো গ্রহণ করো, ফিরে এসে নববর্ষে তোমাকে প্রণাম করতে যেন যেতে পারি সে খেয়াল রেখো।" মা তখন কোথায় তাও জানি না। দু'সপ্তাহের পর আসাম থেকে ফিরে এসে দেখি কনখল থেকে মায়ের আবাহন এসেছে—"তুমি আসবে আনন্দের কথা।" তখন আর কোনো কিন্তু নেই। মাতৃকৃপায় টিকিটও অদ্ভুতভাবে মিলে গেল। আমার স্বামী ও আমি হরিদ্বার রওনা হব, শুনলাম তরুদির ভাগবত ১লা বৈশাখ থেকে। আমরা ১৪ই এপ্রিল দিদিমার সন্ন্যাস উৎসবের দিন হরিদ্বার পৌঁছালাম। ১৫ই এপ্রিল ভাগবত শুরু হলো। এর আগে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই যে, একজনের ভাগবতের সঙ্গে অন্যেরা ভাগবত দিতে পারে। এই ভাগবতের সঙ্গে পুষ্পদি ও কান্তিদি ভাগবত দিচ্ছেন দেখে ভাগবতের ষষ্ঠ দিনে মাকে প্রণাম করতে গিয়ে আমার অন্তরের ইচ্ছা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। "মা, ছোটভাবে যে ভাগবত করা যায় তা তো জানতাম না। এসব দেখে আমার শ্বশুরমশায়, শাশুড়ী, বাবা, মা সকলেই মৃত, এঁদের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে আমার একটা ভাগবত দিতে ইচ্ছা হচ্ছে।" মা কথাটা শোনামাত্র বললেন, "খুব ভালো কথা, তুই এখনই স্বামীজীকে বল্।" মার যেন তর সয় না। আমি স্বামীজীকে বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, "অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবের পর ১১ই মে থেকে একটি ভাগবত হবে সেই সঙ্গে কর।" আমি বললাম, "এতো তাড়াতাড়ি কি করে হবে? আমরা কাল কলকাতা ফিরে যাচ্ছি, টিকিট করা আছে। আমার স্বামী এখনই আবার ছুটি নিয়ে আসতে পারবেন না। মাত্র ১৫ দিন সময় পাবো।" স্বামীজী বললেন, "তাহলে আবার কবে হবে জানি না।" শঙ্কিতমনে মায়ের কাছে

গেলাম ও স্বামীজীর কথা বললাম। মা বললেন, "ভালোই তো — ১১ই তারিখ থেকে ভাগবত শুরু হবে।" এ কথা শুনে আমি আবার স্বামীজীর কাছে ফিরে এসে বললাম, "একলা আসতে হবে। ১৫ দিন মাত্র সময়, টিকিট পাওয়াও যাবে না মনে হচ্ছে।" স্বামীজী মাথা চাপড়ে বললেন, "তুই একলা আসলেই হবে। মা যখন বলেছেন সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই শুধু চেষ্টা কর। ১ দিন আগে পৌঁছলেই হবে।" আবার মার কাছে ছুটলাম। মার কাছে ঢোকার কতো তো বাধা। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কোনো বাধার সম্মুখীন হ'লাম না। মাকে সব বলাতে মা তো খুব খুশী। বললাম, "তোমার বাবা, ছেলে কেউই আসতে পারবে না, আমাকে একলা আসতে হবে। টিকিটও পাওয়া যাবে কিনা জানি না।" মা শোনেন, হাসেন, মাথায় হাত দেন, তবুও মানা করেন না। এতো কম সময় পাবো, আমি মনে মনে ভাবি, মা যদি বলেন এখন না করে পরে করতে, তবে বাঁচি। টাকার কথা স্বামীজীর সাথে যা হয়েছে, মাকে সব বললাম মা মনোযোগ দিয়ে সব শুনে বললেন, "আচ্ছা।" আবার স্বামীজীর কাছে ফিরে গেলাম, বললাম "স্বামীজী আমি যাঁদের সাথে ভাগবত করবো, তাঁরা কোথাকার এবং কে ভাগবত ব্যাখ্যা করবেন?" তখন আমি বললাম, "আমার শ্বশুর, শাশুরী, বাবা, মা কেউই হিন্দী বোঝেন না। স্বামীও সঙ্গে আসতে পারছেন না।" স্বামীজী বললেন, "তাতে কি হবে? স্বামীর মত নিয়ে তুই আসলেই হবে।" আবার মার কাছে চললাম। কোনো বাধা পেলাম না। চট্ করে মায়ের ঘরে ঢুকে পড়ে বললাম, "মা হিন্দীতে ভাগবত ব্যাখ্যা হবে। ওঁরা কেউই তো হিন্দী জানেন না।" মা বললেন, "আত্মার কাছে ভাষার সমস্যা নাই।" মা যখন কেবল উৎসাহই দিয়ে গেলেন তখন আমি বললাম, "আমার শরীরটাও খুবই খারাপ। টিকিট পাবার সম্ভাবনাও খুব কম। এতো অল্প সময় — আর যদি আসি, অক্ষয় তৃতীয়াতে শ্রী শ্রী শঙ্করাচার্য্যের মূর্তি প্রতিষ্ঠা দেখবো না কেন? তুমি সব খেয়াল রেখো তবে হবে।" মা হাস্যোজ্জ্বল মুখে আমার মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। মায়ের আশীর্বাদে মনে খুব বল ভরসা পেলাম। এ বিষয়ে তরুদির ভাগবতাচার্য্য শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ও আমাদের আশ্রমের পূজ্যপাদ নারায়ণ স্বামীজী আমায় খুব উৎসাহিত করলেন। ওঁরা বললেন, "মা যখন খেয়াল করলেন, তখন করে ফেলাই ভালো, শুভকাজ ফেলে রাখতে নাই।" ওঁরাও দু'জনে বললেন, "স্বামীর অনুমতি থাকলে কাজ করা যায়। তাতে কোনো প্রত্যবায় হয় না।" আমার স্বামীও তখন উপস্থিত ছিলেন। শ্রীনারায়ণ স্বামীজী বললেন, "তোমার উপর মায়ের অশেষ কৃপা। তুমি ছেলেকে আনতে চেষ্টা করো।" তখন ছেলের ছুটি পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। স্বরূপানন্দ

স্বামীজী বললেন, "অসুস্থ শরীর, ফেরার টিকিটটা করে যাও নারায়ণ গোস্বামীজীর সাথে। উনি মায়ের জন্মোৎসবে আসবেন।" গোস্বামীজী বললেন, "আমি মায়ের আদেশ মতো অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে উপস্থিত থাকবো। আপনার ভাগবত একদিন শুনতে পারবো। তারপর চলে যাবো। পরে আবার মায়ের জন্মোৎসবে স্বামীজীর নির্দেশানুসারে আসতে হবে। ২৯শে মে ফিরে যাব।" অন্য কোনো সঙ্গী না দেখে ওঁর সঙ্গে ফেরার টিকিট করার জন্য স্বামীজীকে টাকা দিলাম। এদিকে আসা হবে কিনা তারও তখনও নিশ্চয়তা নাই। নিজেও ভালো হিন্দী বুঝি না, ভাগবত হিন্দীতে ব্যাখ্যা হবে বলে মনটা খুঁতখুঁত করছিল। যাই হোক ২৩শে এপ্রিল কলকাতায় ফিরে এলাম। মা কয়েকজন ভক্তকে কিছু দিতে বলেছিলেন বলে ওদের জিনিষ নিয়ে রওনা হয়ে ঐদিন আমার ইচ্ছামতো ভাগবতের কিছু জিনিষ কেনা হয়ে গেল ও অর্ডার দেওয়া হয়ে গেল। ২৩/৪ তাং টিকিট কাটতে দেওয়া হলো। আমার শরীর ভালো ছিল না বলে বৌমা আমাকে এক্‌লা ছাড়তে রাজী হলো না। ওর পরীক্ষা ছিল বলে আমি ওকে সঙ্গে যেতে মানা করেছিলাম। যাই হোক্ ২ দিন পর খবর পেলাম ৭/৫ তাং একটা কূপে পাওয়া গিয়েছে। নিশ্চিন্ত হলাম। সবই মায়ের অদ্ভুত লীলা। এই পনেরো দিনের মধ্যে আমার যে ইচ্ছার উদয় হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তা পূরণ হয়েছে। লোডশেডিং-এর জন্য স্যাকরা অনেককেই গয়না দিতে পারছিলেন না। অথচ আমার সামান্য যা কিছু সব তৈরী হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ছেলে বললো যে সেও ৪/৫ দিন ভাগবতে যোগ দিতে পারবে। ৭ই মে রওনা হয়ে আমরা ৯ই মে কনখলে পৌঁছলাম। স্বামীজী ও নির্মলদা থাকার সুব্যবস্থা করলেন। রাত্রে মাকে শ্বশুর-শাশুরী ও বাবা-মার ফটো দেখালাম। বললাম, কাল থেকে তো ভাগবত। মা কেমন অন্যমনস্ক ও ব্যস্তভাবে বললেন, "কাল থেকে হবে?" এদিকে ভদ্রেশ্বর থেকে গাঙ্গুলী দম্পতি সদলবলে এলেন। তখন শুনলাম ঐ বাঙালী পরিবারের সাথেই আমার ভাগবত হবে। আমি তো শুনে অবাক্। তারপর শুনি বৃন্দাবন থেকে পাঠকও আসেন নাই। এদিকে মা ভাগবত শুরু হবার আগের দিন রাত্রে নারায়ণ গোস্বামীজীকে ডেকে ভাগবত ব্যাখ্যা করার জন্য বললেন। ওনার খুব কাশি, গলা ধরে আছে। পনেরো দিন আগে উনি তরুদির ভাগবত ব্যাখ্যা করেছেন। শরীরও ক্লান্ত। গলাও খারাপ। উনি কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না— মাও বারবার তাঁকে পাঠ করার জন্য বলছেন। গোস্বামীজী তখন মাকে বললেন, "আপনি আমার গলায় হাত বুলিয়ে দিন তবে আমি পারবো।" মা বললেন, বাবা তুমি আগেরবার তো এ কথা বলোনি।" গোস্বামীজী বললেন, "তখন আমি বাড়ী থেকে গৃহদেবতার

সুপ্রসন্ন মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম, আমার কোনো ভয় ভাবনা ছিল না। এখন সবে একটা শেষ হয়েছে, গলা ধরে রয়েছে। আমি পারবো না মা।" কিন্তু মা তাঁকে ছাড়েন না। শেষ পর্যন্ত উনি রাজী হয়ে গেলেন। আমি ফেরার সময় ট্রেনে ওনার মুখ থেকে এ কাহিনী শুনেছি। তারপর উনি বললেন, "মার কাছে রাজী হয়ে আমি চিন্তিত মনে নিজের ঘরে শুয়ে পড়লাম। আমার ঘরের বারান্দায় ছবিদিদের কীর্তন সারা রাত ধরে হচ্ছিল। হঠাৎ শেষ রাত্রে শুনতে পেলাম কে জানি বলছে এই — ওষুধটা খাও। গলা ভালো হয়ে যাবে। তিনবার একথা শুনে আমি সচকিত হয়ে উঠে দরজা খুলে দেখলাম কোথায়ও কেউ নেই। বারান্দায় কীর্তন হচ্ছে। ওষুধটার নাম লিখে রেখে আমি আবার শুয়ে পড়লাম। তখন শেষ রাত। চোখবুজে শুয়ে আছি, দেখি একটা বাচ্চা ছেলে এসে বল্‌ছে, "আমায় সোনার বাঁশী করে দাও।" তখন আমার সর্বদেহ কন্টকিত হয়ে উঠেছে। আমি শয্যাত্যাগ করে উঠে পড়লাম। সকালে উঠে পাটনকে ওষুধটা এনে দিতে বললাম। পাটন ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ বিনা ওষুধ খেতে মানা করলো। কাজেই আমি বাধ্য হয়ে পাটনকে ঘটনাটা বললাম। পাটন অনেক দোকান খুঁজে ওষুধটা জোগাড় করে এনে দিল। ওষুধটার উপর লেখা ছিল যে সেটা কাশি ও গলাভাঙা সারার ওষুধ। মা পাটনের কাছে ব্যাপারটা জেনে আমাকে ডেকে সব কথা শুনলেন।" ওনার শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও মাতৃকৃপায় অতি সুন্দরভাবে ভাগবত ব্যাখ্যা করছিলেন। গলাভাঙার জন্য কোনো অসুবিধাই হয়নি। আমাদেরও বাংলায় শোনার বাসনা মা এভাবে পূর্ণ করেছিলেন।

যাই হোক্‌ ১০ই মে রাত্রে মা আমাকে বললেন কাল ভাগবত শুরু হবার সংকল্প করে গঙ্গাস্নান করে পঞ্চগব্য খেতে হবে এবং এজন্য ভোলাদাকে বলতে বললেন। হলঘরের পেছনের একটা ঘরে আমার মূল ভাগবত পাঠ ও পূজোর ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। তার পাশের ঘরটায় আমাদের উভয় পক্ষের ভাগবতের জিনিষ রাখা হয়েছিল। ১০ তাং রাত্রে বৌমা হলঘরে ব্যাখ্যা করার জায়গায় আল্‌পনা দিল। মা এসে হলের মধ্যে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের মূর্তির কাছাকাছি শুয়ে পড়লেন। ঠিক তার পেছন দিকটাই আমার মূল ভাগবতের ঘর ও উভয় পক্ষের store আগামীকালের আমার পূজোর জিনিষপত্তর মৈত্রেয়ীদি গুছিয়ে রাখতে বললেন। আমি একটা বেতের basket এ প্রায় হাজার দেড়েক টাকার জিনিষপত্তর ভরিয়ে একটা ছোট তালা লাগিয়ে store room এ রেখে গেলাম। ১১ই মে ভাগবত শুরু হবার দিন ভোরে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছি হঠাৎ হংসাবহিন ছুটে এসে বল্‌লো, "ভাগবতের ঘরে চুরি হয়ে গিয়েছে।

তোমার জিনিযপত্তরও বোধ হয় সব গিয়েছে।” আমি ছুটে গিয়ে দেখি আমার basket টা ঠিক একভাবেই আছে। অথচ আশপাশ থেকে দু'পক্ষের প্রায় সমস্ত জিনিষ ফল, মিষ্টি বাসন এমন কি একজনের জপের মালাও সব চুরি হয়ে গিয়েছে। আমার জিনিষগুলো আছে দেখে আশ্বস্ত হলাম। কারণ ওগুলো আমার নিত্য পূজোর রূপোর বাসন মায়ের পূজোর জিনিষ, হরিদ্বারে পাওয়া যেতো না। স্নান সেরে এসে মাকে প্রণাম করলাম ও পরমগুরুরূপে কপালে সোনার চাঁদ পরিয়ে পূজো করে ভাগবত ও সোনার তুলসী হাতে দিলাম। তারপর মায়ের সঙ্গে পাঠের ভাগবত মাথায় করে নিয়ে গিয়ে আমার মূল ভাগবতের ঘরে প্রতিষ্ঠা করলাম। পূজো শুরু হলো। বিকেলে শ্রীনারায়ণ গোস্বামীজী অপূর্বভাবে ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। মা ও স্বামীজী পাঠ শুনে খুব খুশী হলেন। বহু সাধুসন্ত সমাবেশে, মায়ের পূতপবিত্র উপস্থিতিতে মায়ের শ্রীচরণের পাশে বসে ভাগবত মাহাত্ম্য শুনে সকালবেলাকার চুরির বেদনা সব দূর হয়ে গিয়ে মনটা শান্তি ও তৃপ্তিতে ভরে গেল।

ভাগবতের তৃতীয় দিনে কোনো বিশেষ কারণে আমার মনে ভীষণ দুঃখ হয়। মা অনেক সান্ত্বনা দিলেন। তখন বল্‌লাম, “আমার জীবনের তীব্র আকাঙ্খা তোমার পূজো করা। আমি যে কয়দিন পূজো করবো তুমি গ্রহণ করবে তো? তোমার শরীর ভালো যাচ্ছে না এজন্য আমার ভয় করে। মা বল্‌লেন, “এ শরীরকে তোর মূল পাঠের ঘরে ডেকে নিস্ আমি যাব।” ব্যস্, আমার সব দুঃখ এক নিমেষে কোথায় চলে গেল। আমার কোনো জিনিষ চুরি হয়নি শুনে মা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “দেখ তোর কতো ভাগ্য। আশপাশ থেকে অনেক গেল অথচ তোরটা ঠিক থাক্‌ল।”

আমার শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল। পেটের অবস্থার জন্য ব্রতী থাকতে পারবো কিনা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলাম না। ডাক্তার প্রিয়রঞ্জনদার কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ নিয়ে মাকে বল্‌লাম, “মা এ রকম অবস্থা, এ্যালোপ্যাথিক খুব strong ওষুধেও কিছু হচ্ছে না। পাঠে বসে যদি উঠে আসি, প্রত্যবায় হবে। কি করবো?” মা বল্‌লেন, “কবে থেকে হয়েছে?” আমি বল্‌লাম, “আগের ভাগবতে যখন এসেছিলাম তখন “লু” লেগেছিল। তখন থেকেই খারাপ চলছে।” মা বললেন, “তবে সঙ্গে করে নিয়া আস্‌ছো? ওষুধ খাও।” আমি বল্‌লাম, “হোমিওপ্যাথিক না এ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খাবো।” মা হোমিওপ্যাথিক খেতে বল্‌লেন। কিন্তু আমার কোনো উপকার হচ্ছে না। পাঠ শুরু হবে ভয় পেয়ে মাকে আবার বল্‌লাম, “বোধ হয় সব শোনা হবে না।” মা হলে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌লেন, “শিগ্‌গির যা আন নুন

খেয়ে নে।” আমি একদৌড়ে আদানুন নিয়ে খেয়ে নিলাম। আশ্চর্য্য আমার যে পেট chlorostep. এ ধরছিল না আদা নুন খেয়ে আশ্চর্য্য ফল দিল। তারপর মা রোজ জিজ্ঞাসা করতেন, কেমন আছি ও খাওয়ার নানারকম টুকিটাকি যেমন মাঠা, বার্লি, জিরের গুঁড়ো, ইসবগুল, চিনি এসব খেতে বলতেন, কে তৈরী করে দেবে তাও বলতেন। ব্রতীর নিয়মানুসারে খাওয়া আমার সহ্য হলো। পাঠও শোনার কোনো বাধা হলো না। জগৎ জননীর কৃপায় আমি নির্বিঘ্নে ব্রত সমাপন করে জন্মোৎসব দেখে ফিরতে পারলাম। মায়ের কৃপায় ভাগবতের তৃতীয় দিন আমার ছেলে হরিদ্বার এলো ও ব্রতী হলো। বৌমা আমার সঙ্গেই ব্রতী হয়েছিল। মার খুবই খেয়াল ছিল। ভাগবতের গোপালের জন্মদিনে আমি মাকে শ্রীকৃষ্ণরূপে সাজালাম। ছবিদি সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে দিল। বৌমা রূপোর বাঁশী দিয়ে ছিল। বাঁশীটি মা যে কি অপূর্বভাবে ধরলেন তা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। হলুদ সবুজ শাড়ীতে জরির মুকুট মাথায়, নূপুর পায়ে, বাঁশী হাতে মাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল। সৎ ব্রাহ্মণ অনিলদার হাতে একটা সাদা সাটিনের জরি বসানো ছাতি দিয়েছিলাম মায়ের মাথার উপর ধরতে। ঠিক যেন মনে হচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণ বসে আছেন। আমি পূজো শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে মা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে আমি মায়ের ভাব রাখতে পারলাম না। জলশঙ্খে আরতি করার পর মায়ের হাতের কড়ে আঙুল জলে ছুঁইয়ে ঐ জল সকলের মাথায় দেব ভেবে যেই ছুঁইয়েছি মা চম্‌কে উঠলেন। সাধারণ জীব, ঐ মহতী কৃপা ধরে রাখতে পারলাম না। এ বেদনা সারা জীবন থেকে যাবে।

ভাগবতের ষষ্টদিন মঙ্গলবার পড়লো। ঐ দিন আমি মাকে আমার ইষ্টরূপে পূজো করলাম। পরে দেখেছি দিনটা খুব ভালো ছিল, সীতানবমী ব্রত ছিল। সঙ্গে একটি কুমারীপূজো করবো স্বামীজীকে বলেছিলাম। সেই দিন দেখি এক ভক্ত মায়ের উপস্থিতিতে হলঘরে নয়টি কুমারীপূজো করলেন। হলঘর থেকে মা তারপর আমার মূল ভাগবত ঘরে আসবেন। এদিকে কুমারী আসছে না। স্বামীজী রিক্সা পর্যন্ত পাঠিয়েছেন — বারবার খবর পাঠাচ্ছেন অথচ কুমারী আসে না। মা উঠে পড়েছেন আমার ঘরে আসবেন বলে তখন আমি উপায় না দেখে মাকে বল্‌লাম, “কুমারী তো এলো না। তবে কি এই নয়টি থেকে একটি কুমারী আমি পূজোর জন্যে নেবো?” মা বল্‌লেন “নে”। আমি বল্‌লাম, “ওরা তো খেয়ে ফেললো।” মা বল্‌লেন, “তাইতো”। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন “তবে তোর কুমারীও এখন না খেয়ে বসে নেই।” আমি একটি কুমারী নেবো ভাবছি হঠাৎ মা ক্ষিপ্র গতিতে ভাগবতের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়ানো একটি কুমারীর হাত ধরে বল্‌লেন, “নে, এই তোর

কুমারী।" তারপর মেয়েটির সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এ ব্রাহ্মণ হ্যায়?" ওরা বল্‌লো, হ্যাঁ। মা হাসতে হাসতে আসনে বসে পড়লেন। আমি কুমারীকে নিয়ে ঘরে গেলাম। বৌমাও তাড়াতাড়ি বিশুদ্ধা কুমারীকে সাজিয়ে দিল। আমার শরীর তখন কাঁপছে। ছবিদি ও সতীদির সাহায্যে আমি মাকে লাল বেনারসী পরিয়ে, মাথায় জরির মুকুট, মালা, শাঁখা, সোনার লোহা পরিয়ে, কপালে সোনার চোখ লাগিয়ে দিলাম। পায়ে নূপুর পরিয়ে আল্‌তা পরিয়ে দিলাম। মা একেবারে সমাধিস্থ। প্রাণ ঢেলে পূজো করলাম। সমাধিস্থ বলে তখন খাওয়াতে পারলাম না। ছবিদি আরতি সেরে নিতে বল্‌লো। আরতি সুন্দরভাবে হয়ে গেল। আবার সেই নির্বুদ্ধিতা। রাঙ্গাচরণ দু'খানি সামনে পেয়ে সব কিছু ভুলে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। মা চমকে উঠে আমাকে বক্‌লেন, বল্‌লেন কতোবার পা ছুঁতে মানা করা হয়, তবুও ছুঁবি। কথা শুনতে ইচ্ছা করে না বুঝি?" আমি তো ভয়ে কাঠ। বল্‌লাম, "সব ভুলে যাই, কি করবো? ক্ষমা করো।" বল্‌লেন "বারবার কথা শুনিস্ না কেন?" আমি কেঁদে ফেলে বল্‌লাম, "আর কখনও করবো না।" মা গম্ভীর আবার হাসি হাসি ভাব। তারপর মাকে খাওয়ালাম। মা সামান্য কিছু খেলেন। আমাকে মায়ের পুরোনো লোহা ও শাঁখা খুলে দিলেন। আমি বল্‌লাম, "তোমার সোনার লোহা আমি নেবো না। শাঁখাটা দাও লক্ষ্মীর কৌটায় রাখবো।" তারপর মা বললেন, "এখন কুমারীপূজা কর।" আমি তো তখন ভয়ে কাঁপছি। কুমারীকে আসনে বসিয়ে কোনোরকমে পূজো তাড়াতাড়ি শেষ করে নিচ্ছি মা বল্‌লেন, "ভালো করে কর। আগে চরণখানি ধোওয়া। অঞ্জলি দে, খাওয়া।" আমি সেই মতো করে খাওয়াচ্ছি। বল্‌লেন, 'কমলা খাওয়া।" যেই কুমারী কমলার কোয়াটা একটু খেয়েছে, বল্‌লেন, সবটা খায় না, এদিকে দে।" আনার সঙ্গে সঙ্গে মা কমলার কোয়াটা একটু কামড়ে নিয়ে নিলেন। চকিতে ঘটনাটা ঘটে গেল। কুমারীর খাওয়া দিকটা যে উল্টে দেব সে সময়ও পেলাম না। মা হাসতে হাসতে উঠে বল্‌লেন, "এখন আমি আসি।" দু'পা এগিয়ে ফিরে বল্‌লেন, 'কৈ, নূপুরের শব্দ শুনবি বলেছিলি, শোন্।" আমি কাছে ছুটে গেলাম, একটু হেঁটে বললেন, "এখন নূপুর খুলে দে।" আমি বল্‌লাম, "আমি আর তোমার চরণে হাত দেব না, অন্যে খুলুক।" মৈত্রেয়ীদি খুলতে গেলেন। ছবিদি বল্‌লো, "মা পরেই চলো না।" মা হাসতে হাসতে নূপুরটি পরেই চলে গেলেন। ছোট বোন আগমনী নূপুরটি মাকে দিয়েছিল। ওর জীবন ধন্য হলো। আমি কুমারীর আরতি শেষ করে নিয়েছি, মা ঘরে ডেকে পাঠালেন। অনেক ফল দিলেন, আদর করলেন। আমি বল্‌লাম "এতো ফল আমরা খেতে পারবো না, নষ্ট হবে, অল্প করে

দাও।" আবার বল্‌লাম, "মা, আমার তো খুবই অন্যায় হয়ে গিয়েছে। রাঙ্গাচরণ সামনে পেয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে জড়িয়ে ধরলাম, ক্ষমা করো।" মা বল্‌লেন, "ও কথা মনেই রাখবি না।" শান্তিতে মন ভরে গেল।

কুমারীটি মা কিভাবে আবিষ্কার করলেন ভাবতেও এখন আমার আশ্চর্য্য লাগে। মেয়েটি নাকি বম্বে থাকে। তার মাও আত্মীয়দের সাথে সেই দিনই প্রথম আশ্রমে এসেছিল। দেখতে খুবই মিষ্টি। ৭/৮ বছর বয়স বোধ হয়। শাড়ী, জরির মুকুট, মালা পরে, কানে সোনার রিং পরে দেবীর মতো লাগছিল। মাতৃকরুণা যখন ঝরে পড়ে তখন পাত্র অপাত্র ভেদ থাকে না। আমাদের আধার উল্টোমুখী, কাজেই সে করুণা আমরা ধরে রাখতে পারি না।

ভাগবতের সব কিছু রীতিনীতি আমি জানতাম না। একদিন মা একখানা নতুন ধুতি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যা শিগ্‌গিরি, নারায়ণ বাবাকে কাপড়টা দিয়ে বলবি, এটা পরে আপনি আজ ভাগবত পাঠ করবেন।" আমি মাকে ফুলচন্দন দিচ্ছি, মা বল্‌লেন, "তাড়াতাড়ি যা, নয়তো অন্য কাপড় পরে ফেলবে।" আমি তখুনি গিয়ে কাপড়টা দিয়ে প্রণাম করে মায়ের কথা বল্‌লাম। উনি বল্‌লেন, "ধুয়ে, বিকেলে পরবো।" আমি বল্‌লাম, "নতুন কাপড়ে তো দোষ হয় না শুনেছি। তাছাড়া মা'ই তো পরতে বল্‌লেন।" সঙ্গে সঙ্গে উনি বল্‌লেন, "মা যখন বলেছেন, আর কোনো কথা নেই। আমি পরবো।" আমি মার কাছে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে মা জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা কি বললো? পরবেন বলাতে মা খুব খুশী হলেন। শেষ দিনে যে ভাগবতচার্য্যকে কাপড়, ফল ইত্যাদি দিতে হয় ও সোনার আসনে ভাগবত দান করতে হয় তা জানতাম না। মাকে বল্‌লাম, 'আমি তো সোনার তুলসী ভাগবত আগেই দিয়ে দিয়েছি আর কিছু নেই, এখন কি করবো? মা বল্‌লেন, "আমি তোকে কাপড়, চাদর দেব তাই দিস।" আমি বললাম, "মা এতোই যখন হলো আমি একটি গরদের জোড় ও অল্প সোনার একটা আসন চাই। মা রামভাইকে বলতে বল্‌লেন। শেষ হবার আগের দিন বেশ রাত্রে এসব কথা হচ্ছে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রামভাই বল্‌লেন, "আগে বল্‌লে হতো, এখন আর সম্ভাবনা নাই, তবে মা বলছেন দেখি কি হয়।" আশ্চর্য্য মায়ের করুণা যে পরদিন শেষ হবার ঠিক ১০ মিনিট আগে রামভাই এ দুটি জিনিষই আমাকে দিয়ে গেলেন। তার পরদিন ভোরে সব শেষ হলো যজ্ঞে। আমি, ছেলে, বৌমা, গাঙ্গুলীমশাই, তাঁর স্ত্রী এক সাথে বসে যজ্ঞে হবিঃ দান করলাম। পবিত্রতার ভূমি কন্‌খলে বসে অপার্থিব আনন্দ

পেলাম। মা ঠিক পূর্ণাহুতির আগে উপস্থিত হলেন। পূর্ণাহুতি দেবার জায়গায় উপরে আচ্ছাদন ছিল না বলে মা ভয়ানক বিরক্ত হলেন। মা বল্‌লেন, "এ শরীর উপস্থিত থাকতে কোনো ত্রুটি হতে দেব না।" সব ব্যবস্থা পূর্ণভাবে হবার পর মা পূর্ণাহুতির সময় যজ্ঞস্থলে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের কাজ পরিপূর্ণভাবে শেষ করালেন। মাকে প্রণাম করাতে মা মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। মুখে স্মিত হাসি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "মা আমরা তো কিছু বুঝি না, যাঁদের জন্য ভাগবত দিলাম তাঁরা এসেছিলেন তো?" মায়ের সংক্ষিপ্ত উত্তর, "তাহলে হলো কেন?" ব্যস্‌, সব সার্থক। প্রশান্তিতে মন ভরপুর হয়ে উঠলো।

এরপর মায়ের জন্মোৎসব নামযজ্ঞে শেষ হলো। মেয়েদের কীর্তনে মায়ের অপূর্ব ভাব দেখলাম। ও রকম হাত তুলে তুলে নাচ ও ভাব বহুদিন দেখি নাই। বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে ভাবতে লাগলাম আমরা কাকে নিয়ে খেলা করি। ইনিই জাগতিক মা হয়ে সব ভুলিয়ে দেন।

ফেরার পথে শ্রীশ্রীনারায়ণ গোস্বামীজীর সঙ্গে যখন ট্রেনে আসছি ওনার দর্শনের কথা শুনে পুলকিতচিত্তে আমার গল্প সব বল্‌লাম। মায়ের শ্রীচরণ ছুঁয়ে কতো অন্যায় করেছি বলাতে উনি বল্‌লেন — "মোটেই অন্যায় হয়নি। মহাপুরুষরা কখন কিভাবে কি বলেন ও করেন, সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। যদি কখনও তাঁরা আপাতদৃষ্টিতে নিগ্রহসূচক কথাও বলেন, সেটাও ভবিষ্যতে অনুগ্রহের কারণ হয়ে যায়। সুতরাং মায়ের অভিপ্রায় বুঝতে চেষ্টা করুন, কথা শুনেই চিন্তিত হবেন না। ঋষি প্রকৃতি যাঁরা, তাঁরা সাধারণের মতো কথা বলেন না।"

প্রায় ১ মাস মায়ের পবিত্র সান্নিধ্যে কাটিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, তা আমার সারাজীবনের পরম পাথেয় হয়ে রইলো। অতো শরীর খারাপ সত্ত্বেও মনে হ'তো আমরা যেন স্বর্গে বাস করছি। সে অনুভূতি কাগজ কলমের মাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব। সে আমার বোধে বিলীন হয়ে আছে। জয় মা।

আনন্দ বার্তা বর্ষ ২৬, এপ্রিল, ১৯৭৯, সংখ্যা ২

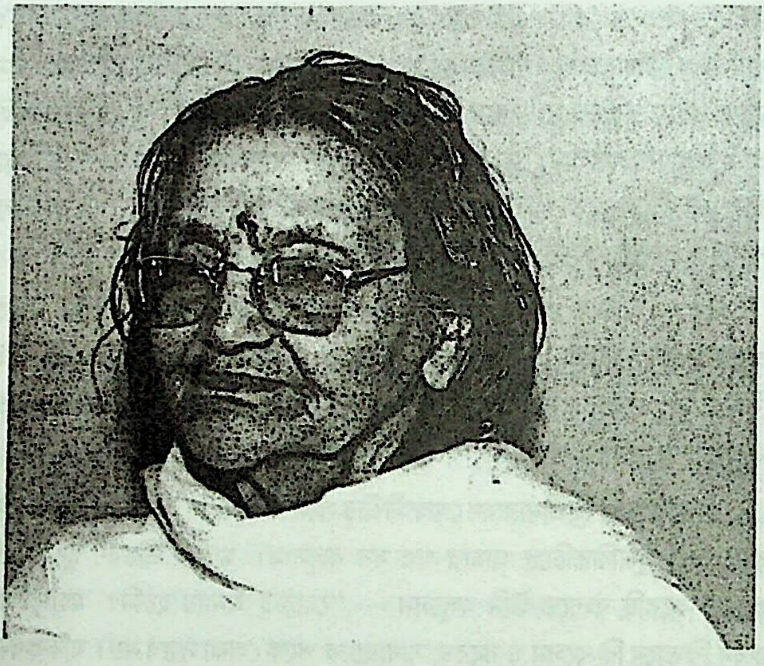

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

মাতৃতীর্থ ভ্রমণ কাহিনী

জয় মা। পূজো এলেই মনটা কেন জানি মাতৃসকাশে যাবার জন্য উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। মা যখন স্বশরীরে ছিলেন প্রায় প্রতিবৎসর পূজোর সময় তাঁর কাছে যেতাম। কোন কোন সময় মা নিজেও যেতে বলতেন। তাই এবার পূজোয় কনখল যাব বলে স্থির করলাম। এখন কনখলে মায়ের সমাধি মন্দিরে মায়ের উপস্থিতি অনুভব করি। ওখানে বসলে মন প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পূজারীর প্রাণঢালা ভক্তিরসে জারিত পূজো মুগ্ধ হয়ে দেখতে দেখতে মায়ের অতীত লীলাখেলার রোমন্থন করি। দুর্গাপূজোর উৎসব সার্থক হয়।

প্রকৃতির রূপ, বরফের পাহাড়ের সৌন্দর্য্য, বহু দেশবিদেশ ঘুরে দেখেছি। এখন আমার প্রকৃতির রূপ দেখার মোহ থেকে বেশী আকর্ষণ মায়ের পূতপদরেণু মাখা স্থানগুলো দেখ্‌বার। তাই এবার কনখলে পুজো দেখে আশ্রমবাসী সকলের ভালবাসা ও সাধু-সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ নিয়ে লক্ষ্মীপূজোর পর দেরাদুন রওনা হলাম। সেবা ও জনবলের অভাবে সবচাইতে পুরোনো মাতৃস্মৃতি বিজড়িত দেরাদুন আশ্রম, মায়ের লৌকিক দেহত্যাগের পুণ্যভূমি খাঁ খাঁ করছে। সেই শয়নমন্দির মেরামত হচ্ছে। কনখলে যে অনুভূতি আমি লাভ করি, ওখানে তা হয় না। কাজের লোকজনের বড়ো অভাব। কর্ত্তৃপক্ষের আদর যত্নের ত্রুটি নেই। আমার ছেলের বৌর কাকা কাকীমা আমাদের সাথে গিয়েছিলেন। ১৭/১০/৯২ তাং মায়ের মর্মর মূর্তির সামনে নির্বাণদা বৌমার দীক্ষাপ্রার্থী কাকাকে দীক্ষা দিলেন।

দু'তিন দিন দেরাদুন থেকে আমরা নির্বাণদার সাথে আলমোড়া রওনা হলাম। দিদির বইতে পড়েছি শ্রীশ্রীমায়ের কৈলাস থেকে ফেরার পথে ভাইজি (শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র রায়) আলমোড়াতে দেহত্যাগ করেন। নির্বাণদার ঐ সমাধি মন্দিরের উপর দারুণ আকর্ষণ। ভাইজির মতো ভক্ত, সিদ্ধপুরুষ দুর্লভ। সরকারের নামীদামী অফিসার ছিলেন। কিন্তু মাতৃগত প্রাণ জ্যোতিষ সংসারের বৈভব, পদমর্যাদা, জাগতিক সুখ সব তুচ্ছ করে মায়ের শ্রীচরণে নিজেকে নিবেদিত করে দিলেন। নিবেদিত পুষ্পের সৌরভে তিনি এখন আলমোড়ার আনন্দময়ী আশ্রমের পাতালদেবীতে

চিরসমাহিত। মা আনন্দময়ী তাঁর প্রিয় সন্তানকে জাগতিক মুক্তি লাভ করিয়ে অধ্যাত্ম জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করেন। তৈলধারাবৎ ধ্যান ধারণা মায়ের উপর ন্যস্ত ছিল। তাই সর্ব দেবদেবীময়ী মা আনন্দময়ী তাঁর আনন্দরাজ্যে এ সন্তানকে অভিষেক করে নেন। নির্বাণদার প্রথম জীবনের মাতৃসঙ্গ এই আলমোড়ায়। মা তাঁকে সব্জী কাটার থেকে সবকিছু এখানে শিখিয়েছিলেন। তিনি মায়ের কথা সুমধুর ভাষায় শুনিয়ে আমাদের তৃপ্তি দিতেন। ওখানকার সেক্রেটারী যোগানন্দ ব্রহ্মচারীজীর ব্যবহারও আর্কষণীয়। পূজোর সময় কনখলে আমার জ্বর ও ব্রংকাইটিস্ হয়েছিল। এজন্য শরীর ভীষণ দুর্বল ছিল। কিন্তু মাতৃকৃপায় একরাত্রিতে সচল হয়ে গেলাম। আমাদের নিয়ে ১/১০/৯২ তাং নির্বাণদা ও যোগানন্দভাই মায়ের পূত চরণ সিক্ত পীঠস্থান ধবলচীনা পাহাড় দর্শন করতে নিয়ে গেলেন।

ধবলচীনা আলমোড়া থেকে ৪০/৫০ কিলোমিটার দূরে। শুনেছি ছয় হাজার ফুটের উপর পাহাড়ের উচ্চতা। হিসাব নিকাশ আমি জানি না। যে অভিজ্ঞতা হলো লিখছি। নীচ থেকে পাহাড়ে হেঁটে উঠতে হবে। ডাণ্ডিকাণ্ডি এসব বহু চিন্তা হয়েছে। কার্য্যতঃ কোনো প্রয়োজন হলো না। আলমোড়ার একটি ছেলে 'যোশী' দেরাদুন থেকে আমাদের সাথে ধবলচীনা যায়। দীর্ঘ সুন্দর পাহাড়ী পথ। বনবনানী, ইউকিলিপটাস, চীর, দেবদারু গাছের সমারোহে শান্ত শ্যামলতা মাখানো নিভৃত নীরব পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা চল্‌ছি। মাতৃ কৃপার টুকরো টুকরো কাহিনী আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে এই যাত্রা সুমধুর। দেরাদুন থেকে রওনা হবার সময় এক ভক্ত আমায় আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন, "তুমি পাহাড়ের নীচ থেকে প্রণাম করে ফিরো। নচেৎ উপরে ওঠার কষ্ট ও ঠাণ্ডায় মরে যাবে।" তখন আমি সত্যিই খুব অসস্থ। কিন্তু মাতৃসুধার tonic যে খেয়েছে এবং স্মৃতিমধুর স্থানে যে বাস করেছে অসুস্থতা তার সৎসঙ্কল্পে প্রতিবন্ধক হতে পারেনি। হেসে বলেছিলাম "পাহাড়ে উঠে ছানার জিলিপী করে সকলকে খাওয়াবো।" ভক্ত দেখলেন এই অবুঝ মহিলা বিপদে পড়বে। ভালবাসার টানে তিনি মন্তব্য করলেন "রবিবার নিস্ফলা বার।" আমাদের যাত্রার দিন রবিবার ছিল। কিন্তু মায়ের স্নেহের টান আমাকে বিচলিত করতে পারলো না। আলমোড়ার পাতালদেবীর সিঁড়ি বেয়ে যে নীচে আশ্রমের ঘরে ঢুকতে যে সকলের সাহায্য নিয়েছিল, রাত ফুরোলে সেই মানুষই স্বচ্ছন্দ গতিতে রওনা হয়েছিল।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। স্বামীজীর আদেশে যোশীভাই একটা গাছের

ডাল ভেঙে আমার হাতে দিল। পাহাড়ে ওঠার জুতো সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য তা ভুলে বাথরুম শ্লিপার পরেই চলে গিয়েছিলাম। ঐ পাহাড়ের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারী শান্তিব্রতদা হঠাৎ জরুরী কর্মনির্দেশে দিল্লী চলে যান, এক বাণপ্রস্থী ভক্ত চতুর্বেদী মহাশয়ের হাতে আশ্রমের ভার দিয়ে। শান্তিদার পদ্মনাভজীর দর্শনও মস্ত আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তের কোলে চেপে দিল্লী চলে গেছেন।

মাতৃ স্মৃতি অনুরণিত স্থান। মাতৃচরণসিক্ত ধূলিকণা আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো উপরে নিয়ে চললো। একটা সুবৃহৎ বরফের range তার মধ্যে ত্রিশূল সব চাইতে বড়ো করুণাময়ী মায়ের মতো শুভ্রবেশে আমাদের পথনির্দেশক হয়ে চললো। সে যে কী অপূর্ব শোভা তা আমার মতো অ-কবি মনের বর্ণনার ক্ষমতা হবে না। সাধুসঙ্গ তীর্থ যাত্রার একটা অপার্থিব আনন্দ দেয়।

সাধু মহাত্মাদের চরিত্র সাংসারিক জীবনে অনেক কিছু শেখায়। তাঁদের সহনশীলতা, মিষ্টি কথাবার্তা, জপ, ধ্যান ও অনলস কর্মক্ষমতা তা সত্যিই শিক্ষণীয়। তাঁরা কেউ কেউ ক্ষণক্রোধী। পরমুহূর্তে ক্রোধ ভুলে শিশুর মতো সরলতায় আলাপন করে যান। এ নিয়ে আমরা হাসাহাসি করতাম।

মায়ের ব্যবহৃত ঘর দেখে অশ্রুসজল চোখে প্রণাম করলাম। মনে হলো মা আগের মতো খুশী হয়ে বল্‌ছেন, "ভালো আছো তো?" উপরে আশ্রমঘরে যাবার পথে এক কাণ্ড। শান্তিব্রতদার প্রিয় একটা বড়ো কুকুর আছে। সে নির্বাণদারও পরিচিত। যেই নির্বাণদা দূর থেকে "কালী" বলে ডেকেছেন সে তার বাঁধা দড়ি ছিঁড়ে আমাকে এক ধাক্কা মেরে নির্বাণদার পা চেটে চেটে আদর জানালো। আমার তো তখন হৃদ্‌কম্প, কর্তা, যোগানন্দভাই, যোশীরও সেই অবস্থা। তার প্রভু তাকে বেঁধে ফেলাতে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তারপর সেই নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করে, মাতৃ কথামৃত পান করে অপার শান্তি পেলাম। সবই আছে, আবার সবই শূন্য এই অনুভূতি মাঝে মাঝে তাড়না করে। মায়ের সেই দেহধারী উপস্থিতি আমাদের জীবনের চরম ও পরম প্রাপ্তি ছিল, সে অভাব বোধ তো যাবে না।

সবাই তখন ক্ষুধার্ত। শান্তিব্রতদা সব ঘর খুলে রেখে গিয়েছেন। উনি জানতেন আমরা যাব। নির্বাণদার সব পরিচিত স্থল। ব্রহ্মচারীজী গ্রামের ছেলেদের ধর্মজীবনের

সহায়তা করছেন। নিত্য সৎসঙ্গ করেন এবং পদ্মনাভজীর নিত্য সেরাপূজা করেন। আশ্রমটিকে ছবির মতো সুন্দর করে রেখেছেন। গ্রামবাসীরা শান্তিব্রতদাকে খুব ভালবাসে। তাঁর গৃহস্থালীর জিনিষপত্তর দিয়ে নির্বাণদা ক্ষিপ্র হস্তে স্বাদু খিচুড়ী ও পাঁপড়ভাজা করে ফেললেন। যোগানন্দভাই আলু কাটলেন। আমি fruit salad কেটে দিলাম। সকলে একই সময়ে খেতে বসলেন। মনে হলো চড়ুইভাতি হচ্ছে। মা নিশ্চয়ই খুব হেসেছেন। মায়ের সেই প্রাণমন খোলা হাসি যেন শিরায় শিরায় অনুরণিত হয়। photo তোলা হলো। চতুর্বেদী মশায়ও একসাথে খেয়ে উঠে মাতৃকথা বললেন। বেলা তিনটার সময় আমরা পাহাড় থেকে নেমে এলাম। সাধারণতঃ ওঠার সময় বেশী কষ্ট হয়। নামার সময় ততো হয় না। আমি ওঠার সময় উৎসাহে কষ্ট বুঝি নাই। নামার সময় খুব কষ্ট হয়েছে। ধবলচীনায় খুব জলকষ্ট। শান্তিব্রতদা solar cooker ও করেছেন।

পাহাড় থেকে নেমে শুনলাম কাছাকাছি ১০/১৫ কিলোমিটার এর মধ্যে আর একটা পাহাড় "কৃষ্ণপ্রেম" নামের ফরাসী দেশীয় সাধুর আশ্রম ও সমাধি আছে। জায়গাটার নাম উত্তর বৃন্দাবন। মহাত্মা কৃষ্ণপ্রেম যশোদামাই এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। Lucknow University. র Vice Chancellor স্বনামধন্য জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের স্ত্রী ছিলেন যশোদা মা। তার পূর্বাশ্রমের নাম আমার জানা নেই। তখনকার Society মক্ষীরাণী ছিলেন তিনি। ফরাসী সাহেব কৃষ্ণপ্রেমের পূর্বাশ্রমের নাম আমি জানি না। তিনি যশোদামায়ের চাকচিক্যে ভোলেননি। অন্তরে যে তিনি মহাসাধিকা তিনি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর সমাধি অবস্থায় তাঁকে আবিষ্কার করে তিনি দীক্ষা নেন। শুনেছি যশোদা মা তাঁর "কৃষ্ণপ্রেম" নামকরণ করেন। সাধনরাজ্যে তিনি অনেক এগিয়ে যান। সাহেবরাই আশ্রমটি পরিচালনা করেন। কারখানা, অনেক গরু, ক্ষেত, বাগান, অপূর্ব ফুলের শোভা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আশ্রম। বর্তমান সেক্রেটারী আমাদের মন্দির দর্শন করালেন। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। কৃষ্ণঠাকুরের অপূর্ব রূপ ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। গায়ের রং যে কী সুন্দর তা বোঝানোর ক্ষমতা আমার নেই। সেই তমালবরণ শ্যামসুন্দর সত্যিই আকর্ষণীয়। শান্তপরিবেশে নিঃশব্দে সব কাজকর্ম চলছে। অধ্যক্ষ মন্দির দর্শন করিয়ে নির্মাল্য ও প্রসাদ দিলেন। কোনো আড়ম্বর নেই। আমার তখন শরীরের অবস্থা কাহিল। দর্শনীয় স্থান সকলে দেখতে চান তাই গেলাম। কৃষ্ণের আকর্ষণীয় রূপ ভোলার নয়। পাহাড় থেকে নেমে ফেরার পথে আর একটা বড়ো মন্দির

পড়লো। স্থানের নাম মনে নেই। দেবতার নাম 'গলুদেবতা'। সেখানে নাকি মানত করলে দেবতা ইচ্ছা পূরণ করেন। মনস্কামনা পূর্ণ হলে ঘন্টা দিয়ে পূজো দিতে হয়। হাজার হাজার ঘন্টা, ছোট বড়ো, বৃহৎ, মাঝারি সারা মন্দিরে ঝুলছে। আমরা ঐ স্থানে চা খেয়ে আবার আলমোড়ার দিকে রওনা হলাম। যোগানন্দভাই পথে বললেন যাগেশ্বর বলে একটা জায়গা কিছু দূরে আছে। সেখানে জ্যোর্তিলিঙ্গ নাগেশ্বরম্ আছেন। কিন্তু তখন রাত হতে চলেছে তাই ফিরতে হলো। সকলে খুব ক্লান্ত। কিন্তু ঐ জ্যোর্তিলিঙ্গ দর্শনের ইচ্ছা আমাদের সকলেরই ছিল। দ্বারকা ও প্রভাসের মাঝে যে নাগেশ্বরম্ শিব আছেন অনেকে সেটাই দ্বাদশলিঙ্গের একটি বলেন। আমি সেই শিবজীকে দর্শন করেছি। সে স্থানও অপূর্ব। দ্বাদশ জ্যোর্তিলিঙ্গ বর্ণনায় আছে দারুকাবনে উনি অধিষ্ঠিত। যাগেশ্বরে অসংখ্য দেবদারু বন আছে। যা নাকি প্রভাসের কাছেরটিতে নেই। মতান্তর যাই থাক, দর্শন করা হবে, অনেক রাত্রে তা স্থির হলো। পরদিন শুনলাম নির্বাণদা শুয়ে পড়েছেন বলে যোগানন্দভাই তাঁকে রাতে কিছু জানান নাই। সকালে আমরা প্রস্তুত। এদিকে নির্বাণদা তাঁর নিত্যপূজা শেষ করে চন্দনমাখা বেলপাতা, ফুল সব ভাইজির সমাধি মন্দিরের শিবকে চড়াবার জন্য রেখে দিয়েছেন। আমাদের কাছে যাবার কথা শুনে শিবের কাছে মার্জনা চেয়ে জ্যোর্তিলিঙ্গ নাগেশ্বরম্‌কে চড়াবার জন্য সব নিলেন। ফল কিনে গাড়ীতে ফেলে রাখা হয়েছিল, কারো মনে ছিল না। তাও শিবঠাকুরকে চড়াবার জন্য নেওয়া হলো। আমি একটা পাত্রে ব্রহ্মকুন্ডের জল নিয়েছিলাম পদ্মনাভজীকে দেবার জন্য। তিনি ওখানে ছিলেন না বলে ধবলচীনা থেকে ওটা ফেরৎ এনেছিলাম। তাও শিবজীর জন্য নেওয়া হলো। মাতৃ কৃপায় ফল, ফুল, বেলপাতা, গঙ্গাজল, ধূপ সবই জোগাড় হয়ে গেলো। যোগানন্দজীর আগে দর্শন হয়েছিল বলে ওঁর আশ্রমের অতিথি এক বৈষ্ণব সাধুকে দর্শনের জন্য আমাদের সঙ্গে পাঠালেন। উনি দুপুরের আহারের জোগাড় রাখবেন বলে থেকে গেলেন। পাহাড়ের মাঝ দিয়ে যাত্রার পথ। চড়াই নেই। আলমোড়া থেকে প্রায় ৫০/৬০ কি.মি দূরে। যাত্রার পথ দেবদারু বনের শ্যামলিমায় অপূর্ব সৌন্দর্য্যমণ্ডিত। একটা ঝরণা কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে, মন শান্ত হয়ে যায়। নির্বাণদা বলছেন, "গাঁজা ভাং খেলে কি হবে? শিব ঠাকুরের choice আছে" সত্যিই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়। আমাদের কপাল ভালো। আমরা পৌঁছাবার আগে এক মন্ত্রী দর্শন করতে এসেছিলেন। তাই নাগেশ্বরম্ ও তাঁর পুরোহিত সেজেগুজে সতরঞ্চি পেতে বসে আছেন। নির্বাণদা আমাদের পূজোর সামগ্রী দিয়ে পূজো করিয়ে দিলেন। বৈষ্ণব সাধু তাঁর ভাবে চললেন। মন্দিরে চারিদিকে জানি না কতো হাজার হাজার

বছরের বিরাট বিরাট দেবদারু গাছ। সে শোভা। দেখবার মতো। দূরে বরফের পাহাড়। এক কথায় অনবদ্য প্রাকৃতিক দৃশ্যমণ্ডিত শান্তিস্থল। ঝরণা মন্দিরের গা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশে শিবঠাকুর বিরাজিত! গাছগুলো দেখলেই বোঝা যায় এস্থান কতো পুরোণো। পূজা শেষে পথে চা খেয়ে, ফিরে এলাম পাতালদেবী আশ্রমে। আমার পূর্বসর্তস্মরণ করে ছানার জিলিপী খাবার বায়না ধরলেন সাধুরা। নিস্ফলা বারকে সফলতায় পূর্ণ করতে হবে সে একখানাই হোক্ বা দু'খানা জিলিপী হোক্। ওঁদের ছেলেমানুষী দেখে আমরা হেসে বাঁচি না। যোশীভাই বাজারে ছুটলো ছানা কিনতে, না পেলে দুধ আনবে। যোগানন্দজী গাছের লেবু ছিঁড়তে গেলেন। নির্বাণদা Comment করছেন, "ওর কি কোনো গোছগাছ আছে রসকষ হীন। এখন লেবুতে রস হয়েছে কিনা দেখুন।" কিন্তু ঐ লেবুই কাজ উদ্ধার করলো। ছানা পেলো না, প্রচুর দুধ এলো। আমি অনেক ছানার জিলিপী, ক্ষীরের বড়া তৈরী করলাম। ভাইজিকে দেওয়া হলো। সকলে প্রসাদ পেলেন।

পরদিন ২১/১০/৯২ তারিখ সকালে দেরাদুন রওনা হলাম আলমোড়ার পবিত্র স্মৃতি বহন করে। ২২/১০ তারিখ বিশ্রাম করে ২৩ তারিখ উত্তরকাশী রওনা হলাম। আমাদের উত্তরকাশীর আশ্রমের মাকালীর পূজো ২৫ তাং নির্বাণদা করবেন।

আমার শ্বশুর বাড়ীর নিয়ম অনুসারে কালীপূজোর প্রদোষে লক্ষ্মী পূজো করতে হয়। ১৯৬৭ সনের October মাসে বৃন্দাবনে কালী পূজোর প্রদোষে মায়ের হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি দিয়ে আমি মার শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবো এই অভিপ্রায় জানাবার সঙ্গে সঙ্গে মা বাঁটুদাকে দিয়ে আমার ঐ পূজো সবকিছু নিয়ম অনুসারে করার আদেশ দিলেন এবং বললেন প্রদোষে নিজে উপস্থিত থাকবেন। গৌরাঙ্গ মন্দিরের মধ্যে পূজোর ব্যবস্থা করতে বললেন। আমি তখন জানালাম সব নিয়ম যদি পালন করতে হয় তবে ঠাকুর আড়াই দিন থাকবেন ওখানে তা কি করে সম্ভব হবে? মা তখন রামমন্দিরে সব জোগাড় করতে বলে, ভোগ যা যা দেওয়া হবে সব জেনে এক দিদির উপর সেই ভোগ রান্নার ভার দিয়ে বললেন, "ওর হাতের রান্না ভালো তাই ওকে তোর পূজোর ভোগ রাঁধতে দিলাম।" আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ব্যাপার হলো সব লেখা সম্ভব হলো না। মা একঘন্টা ধরে সেজেগুজে বাঁটুদার পূজোর কাছে পূর্বমুখ করে বসে রইলেন। আমি, সকলে মাকে জানলা দিয়ে দেখতে পাবে বলে উত্তরমুখী লক্ষ্মী বসিয়ে মায়ের চেয়ার ঐভাবে রেখেছিলাম। মা বসে নিজে হাতে চেয়ার পূর্বমুখী করে নিলেন। বাঁটুদা অঞ্জলি মন্ত্র বলছেন আমার স্বামী মা লক্ষ্মীর

পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছেন আমি দু'বার মায়ের চরণে দিতেই মা তৃতীয়বার আমার হাতটা ধরে লক্ষ্মীর চরণ দেখিয়ে দিলেন। আমি লক্ষ্মীকে দিয়ে আবার মাকে দিলাম। আমি মাকে ফলমিষ্টি, সুজির পায়েস খাইয়ে দিলাম। মোটকথা মা খুবই প্রসন্ন ছিলেন। যখন মা ঘরে ফিরে যাবেন শাড়ীটা খুলে দেবেন বললেন। আমি বললাম তোমার ঘর পর্যন্ত পরে যাও। রামমন্দির থেকে মায়ের ঘর কিছুটা দূরে। আমি যখন ছলিয়া মন্দিরের কাছ দিয়ে মাকে ঘরে পৌঁছাতে নিয়ে যাচ্ছি তখন আমি বললাম, "মা তুমি ১৯৬১ সনে আগরপাড়ায় বলেছিলে এ শরীরটা সর্বদা তোর সঙ্গে থাকে। তখন এটা কথার কথা ভেবেছিলাম কিন্তু আজ বুঝলাম আমি তোমাকে যতোটা না ভালবাসি তুমি তার চাইতে আমাকে অনেক ভালবাসো।" মার কী হাসি, বললেন "তুমি খুশী হইছো তো?" মা আমাদের প্রসাদ নিতে বললেন। আমি বোললাম ছলিয়া মন্দিরে কালীপূজো দেখে পরে প্রসাদ নেব। তখন বললেন— খুব চুরি হয়, দরজা জানলা ভালো করে বন্ধ করে যাবে। চিত্রাদি কার জন্য প্রসাদ নিতে এসে বললো সব বন্ধ থাকলে ভোগ পায়েস সব নষ্ট হয়ে যাবে। মা বন্ধ করতে বলেছিলেন বলে মাকে কথাটা জানালাম মা বললেন, চিত্রাকে বলো, "ও প্রসাদ কখনো নষ্ট হবে না।" কালীপূজোর পর অন্যান্যরা অনেকে প্রসাদ খেলেন। আমরা ক্ষিদে পাবার জন্য মা ও দিদির নির্দেশে আগেই প্রসাদ নিয়েছিলাম। পূজোর পর তিনদিন ছিলাম। সত্যিই সে পায়েস তখন নষ্ট হয় নাই। এই হলো মার করুণা। আমি কোনো পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে ঐ ষোড়শোপচারে পূজো করতে যাইনি। শুধু মাতৃচরণে অঞ্জলি দেব এই আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। মা যে নিজে বসে ঐভাবে পূজো গ্রহণ করবেন এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। সেই পরম সৌভাগ্যের দিন আমার অতি সাধারণ আলপনা দেখে মা খুশী হয়ে প্রশংসা করেছিলেন।

তাই এবার কালীপূজো উত্তরকাশীতে হবে জেনে আমি নির্বাণদাকে আমার লক্ষ্মীপূজো ঐদিন প্রদোষে কোরে দিতে পারবেন কিনা জানতে চেয়েছিলাম। নির্বাণদা কৃপা করে রাজী হয়েছিলেন এবং আমাদের ধবলচীনা যাবার অভিপ্রায় জেনে লিখেছিলেন সম্ভব হলে উনি ধবলচীনা যাবেন। সেই সাহসে ভর করে আমরা যাত্রা করি।

আমি, আমার স্বামী, নির্বাণদা, শৈলেশদা ২৩/১০ তারিখ উত্তর কাশী রওনা হলাম। ওদিকে ঐদিন কনখল থেকে ভাস্করদা, মৈত্রেয়ীদি, খনাদি, রত্না রওনা হলো। কন্যাপীঠের দু'টি মেয়েও এলো। কলকাতা পার্টির গীতাদিরাও গেলেন। ভাস্করদাদের

Taxi আমাদের কিছু আগে পৌঁছেছে। Bus এর সবাইও পৌঁছেছেন। ভাস্করদারা পূজোর প্রচুর বাসন ও মৈত্রেয়ীদিরা পূজোর সব জিনিষপত্তর নিয়ে গেলেন। নির্বাণদাও অনেক বাসনপত্তর নিলেন। স্থানীয় রাণু মুখার্জ্জিরা, কল্যাণীদিরা খুব সাহায্য করছেন।

উত্তরকাশীর পার্বত্যপথ সুন্দর প্রাকৃতিক শোভায় রমণীয়। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে নীল স্বচ্ছসলিলা গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। ৫ ঘন্টা লাগলো পৌঁছাতে। বেনারসে যা যা মন্দির আছে এখানেও সেই সব মন্দির আছে। তাছাড়া এ স্থান সাধুমহাত্মাদের তপোভূমি। বহু আশ্রম আছে।

আমাদের আশ্রমের বর্তমান সেক্রেটারী শঙ্করমহারাজ সকলের থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমরা স্বামী-স্ত্রী নিকটেই একটা হোটেলে ছিলাম। তখন আমার শরীর আবার খুব খারাপ হয়। পরদিন সকালে ভাস্করদা, নির্বাণদা হোটেলে দেখতে এলেন। খুবই অব্যবস্থার মধ্যে কাজকর্ম সব হচ্ছে। কালীমন্দির আগে যা দেখেছিলাম তার চাইতে অনেক ভালো দেখলাম। ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি দেখলাম। সরকার, Public এবং বহু জনহিতকর সংস্থা প্রচুর সাহায্য করছেন। গীতাদি ও কন্যাপীঠের মেয়েরা বড়ো বড়ো বাসন মাজলেন। খনাদি লক্ষ্মীপূজোর ভোগ, গীতাদিরা কালীপূজার ভোগ রাঁধলেন। ব্যবস্থা Picnic করার মতো। নির্বাণদা, শৈলেশদা, ভাস্করদা পূজোর সব জোগাড় করলেন। মৈত্রেয়ীদি তাঁর ভাণ্ডার থেকে পূজোর উপকরণের সুচারু ব্যবস্থা করলেন। রত্না, গীতাদিদি, রাণুদি খুবই পরিশ্রম করলেন। দেওয়ালী উৎসবে পাহাড়ীরা যারা ঘরের কাজকর্ম করে, সব দেশে চলে গিয়েছে দেওয়ালী ওদের প্রধান উৎসব। তাই সকলকে অজানা জায়গায় পরিশ্রম করতে হয়েছে। আশ্রমের পাশ দিয়ে গঙ্গা যেন নীলাম্বরী শাড়ী পরে প্রবলবেগে ছুটে চলেছে। স্বচ্ছ জল, অপূর্ব দৃশ্য। গঙ্গোত্রী থেকে প্রবলবেগে গঙ্গা নেমে আসছেন উত্তরকাশীতে। সাধুরা গঙ্গায় স্নান করলেন। ডুব দেওয়া যায় না কারণ উপলবেষ্টিত প্রবল জলস্রোত। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সাধুরা মগ, বাল্‌তী দিয়ে স্নান করলেন। ঐ পূতপবিত্র জল আমরা সকলে মাথায় নিলাম। আমি মায়ের দোতালার ঘরের সিঁড়ি থেকে আরম্ভ করে ঘর পর্যন্ত আলপনা দিলাম বৃন্দাবনের স্মৃতি স্মরণ করে। কালী মন্দিরের সামনাসাম্‌নি মায়ের ঘর। ভাস্করদা মায়ের ঘরের পাশের ঘরে ছিলেন। আলপনা দেখে উনিও খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। রত্না মাকে লালরেশমী শাড়ী পরিয়ে দিয়েছে। সারা ঘরের আল্পনার মধ্যে লক্ষ্মীরূপিণী মা তাঁর শয্যায় বসে আছেন। সকলে বলছেন মা

এসে গেছেন। আমাদের আনন্দ আর ধরে না। নির্বাণদা প্রদোষে পূজোয় বসলেন, শৈলেশদা সব জোগাড় করে দিচ্ছেন। ভাস্করদা আসন পেতে বসেছেন। উত্তরকাশী র মতো পবিত্র স্থানে, মায়ের শয়নকক্ষে মার মূর্তি জ্বলজ্বল করছে। অধরের সেই মৃদু হাসি, চোখ বন্ধ করে নির্বিকার ভাবে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকা, সব যেনো জীবন্ত হয়ে উঠলো। পূজারীর আন্তরিকতা, মায়ের প্রিয় সন্ন্যাসীদের উপস্থিতি তাকে আরো প্রাণবন্ত করে তুললো। আশ্রমবাসী সবাই এসে পূজো দেখলেন, অঞ্জলী দিলেন। সন্ধ্যায় খনাদি পোলাও, লাবড়া, পাঁচরকম ভাজা, লুচি, পায়েস সুন্দর করে ভোগ সাজিয়ে আনলেন। অপার্থিব আনন্দে সকলের মন ভরে গেল। এতোদূরে ঐ পরমতীর্থে এইভাবে যে পূজোটা হবে তা কখনোও কল্পনা করিনি।

আমরা যখন দিল্লীতে ছিলাম ১৯৭৩ সন, মায়ের জন্মোৎসব উত্তর কাশীতে হয়। আমার Gall bladder operation হওয়াতে যেতে পারিনি। আমার স্বামী গিয়েছিলেন। সেই সময় কলকাতায় বদলীর খবর আসে। মা যখন ফিরলেন আমি হরিদ্বারে মায়ের সাথে দেখা করি। দুঃখ করে মাকে বলেছিলাম উত্তরকাশীতে তোমার সঙ্গ করতে পারলাম না। মা বলেছিলেন, “দ্যাখো কি যোগাযোগ হয়।” তার প্রায় ১১ বছর পর কনখল যাই। গঙ্গোত্রী দর্শন করতে যাবো। স্বরূপদা আমাদের নিয়ে উত্তরকাশী এলেন এক রাত আশ্রমে থেকে পরদিন গঙ্গোত্রী গিয়েছিলাম সেই প্রথম উত্তরকাশী দর্শন, আবার এবার কালী পূজোয় এসেছি। সেই যোগাযোগ এতো সুন্দরভাবে যে হবে তা তো ভাবতেও পারিনি। মায়ের কথা কখনোও ব্যর্থ হয় না।

রাত ১০টায় নির্বাণদা কালীমায়ের পূজোয় বসলেন। শৈলেশদা সব জোগাড় করে দিচ্ছেন। নানা আশ্রমের সাধুরা ভক্তিসঙ্গীত গাইছেন। কুমারী পূজা যজ্ঞ হলো। সুশৃঙ্খলায় সবকিছু হয়ে গেল। পরের দিন সাধু ভাণ্ডারা হলো। অন্নকুট ছিল তাও খুব সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হলো। অতো অসুবিধে, অব্যবস্থার মধ্যে মা তাঁর কাজ কিরকম সুচারুভাবে করিয়ে নিলেন ভাবলে আশ্চর্য্যবোধ হয়। মায়ের কাজ মায়ের উপস্থিতির প্রভাবে ওভাবে হয়ে গেল।

২৮ তারিখ দেরাদুন ফিরে ২৯ তারিখ কনখল এলাম। রাতের গাড়ীতে কলকাতা রওনা হলাম। জয় মা।

আনন্দ বার্ত্তা, বর্ষ ৪০, জুলাই ১৯৯৩, সংখ্যা ৩

আনন্দরসামৃত

আমার জীবনে মাতৃসঙ্গের যে প্রভাব পড়েছে তার কিছুটা পরিবেশন করছি। তত্ত্বকথা আমি বুঝি না। ঐ দেবীস্বরূপা ঐশ্বর্য্যময়ী মায়ের সাধারণ মা হিসেবে, যে গুণগুলো আমার চোখে পড়েছে এবং যা অনুকরণ করলে আমাদের মনুষ্যজীবন সার্থক হয় সেই সম্বন্ধে দু'চারটি কথা লিখছি।

মাকে কেন এতো ভালবাসি এ প্রশ্ন অনেকে করেন। এর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না। তবে বলেছি, কেন ভালবাসি জানি না। যতক্ষণ মার কাছে থাকি একটা পরিপূর্ণ আনন্দের অনুভূতি মনপ্রাণকে মাতৃচরণে কেন্দ্রীভূত করে রাখে এবং দেহ মন দিয়ে আনন্দের স্ফূর্তি প্রকাশ পায়। দেহটা হাল্কা বোধ হয়, মনটা শান্তভাবে আচ্ছন্ন থাকে কোনো দুঃখকষ্ট বোধ তখন থাকে না। ভগবান তো আনন্দ স্বরূপ, সেই আনন্দের ছোঁয়া লাগে বলেই ভালো লাগে। মাতৃসঙ্গ আমরা সকলেই করি। কিন্তু তাঁর নরদেহধারী লীলাবিলাসের সামান্য সামান্য লোকাচার যদি গ্রহণ করতে পারি জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

মাকে কখনও বিষণ্ণ বা বিরক্তভাবে থাকতে দেখি নাই। পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা যেনো ছায়ার মত মার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো।

আগরপাড়া শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবস। আমি মাকে সেদিন পূজো করবো বলে বলেছিলাম। মা বলেছিলেন, "দ্যাখো, কি যোগাযোগ হয়।" মা যদি কাউকে কোনো কথা দিতেন, বিশেষ করে যোগাযোগ শব্দটা ব্যবহার করতেন, সেটা যেভাবেই হোক পূর্ণ করতেন। আমি মাকে কিছু নিবেদন করবো বলে মন্দিরের পেছনের বারান্দায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করছি। অসম্ভব ভিড়। মার আর দেখা পাই না। ভিড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ তড়িৎ গতিতে মা মন্দিরের পিছনের বারান্দায় এসে নীচু হয়ে কি জানি একটা লক্ষ্য করছেন দেখলাম। ঔৎসুক্যবশতঃ আমি দেখতে গেলাম। দেখি সামান্য একটু ছাই ওখানে পড়ে আছে। কেউ হয়তো পূজোর বাসন মেজে গিয়েছে। মা তাই দেখছেন এবং বললেন, "সব পরিষ্কার রাখতে হয়।" একজন তৎক্ষণাৎ জায়গাটা ধুয়ে দিল। মা আমাকে স্বল্প সময় দিয়ে পূজো গ্রহণ করেই মন্দিরে ঢুকে গেলেন। এই হলেন বিশ্বতঃ চক্ষু মা।

অতিথি সেবা যে কীভাবে করতে হয় মা তা নিজে করে দেখিয়েছেন। সাধুমহাত্মাদের সাদর অভ্যর্থনা ও বিদায়ের মুহূর্তে প্রত্যুদ্‌গমন যা রামায়ণ মহাভারতে পড়া যায়, মা ঠিক তাই করতেন। যে চরণ দর্শনের জন্য মহাত্মারা লালায়িত, মা তাঁদের কাছে "ছোটী বাচ্চী" সেজে তাদেরকে যেরকম আপ্যায়ন অভ্যর্থনা করতেন তা আমাদের পরম শিক্ষণীয়। দিল্লীতে দেখেছি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এসেছেন আশ্রমে। মা তাঁর আসন থেকে নেমে জওহরলালজীর কার্পেট আসনে বসে আলাপচারিতা করছেন। যোগ্যতা অনুসারে কীভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, সেই রীতিনীতি সকলকে শিখিয়ে দিতেন। মা যখন ফলপ্রসাদী সাজিয়ে দিতেন তা অনবদ্য শিল্পগুণ সম্পন্ন একটি সৃষ্টিকলা রূপে প্রকাশ পেতো। ঠাকুরের নৈবেদ্য যে কী সুন্দরভাবে সাজাতে হয় তাও মা শিখাতেন। যোগ্যতার মূল্যায়ণ মা সর্বদা নিজে করে সকলকে শিখিয়ে দিতেন। মায়ের এই ভাব কিছুটা অনুকরণ করলেও গৃহীর জীবন পূর্ণতায় ভরে উঠবে। শোকার্ত্তের জন্য মাতৃহৃদয়ের উদ্বেলতা দেখবার সৌভাগ্যও হয়েছিল। বিজয়নগরের মহারাজ কুমার ক্রিকেট ক্রীড়ানুমোদী V.G. -র accident -এ মৃত্যু হয়। রাজমাতা বহু সন্তান হারিয়েছেন, ভগ্নহৃদয়ে এই নিদারুণ শেষ আঘাত পেয়ে ছুটে বিন্ধ্যাচলে মার কাছে এলেন। আমি সে সময় বিন্ধ্যাচলে মার কাছে ছিলাম। রাজমাতা ধীরে ধীরে গাড়ী থেকে নেমে আসছেন। মা ভালো কার্পেট পাতিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি মাতৃসন্নিধানে এসে বসেছেন, নয়ন জলে বক্ষস্থল ভেসে যাচ্ছে। মার্বেল মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে আছেন। মা চৌকিতে বসেছিলেন। চৌকি ছেড়ে মা ছুটে গিয়ে রাজমাতার কোলের কাছে বসে পড়লেন। অবারিত অশ্রুধারা মায়ের দুটি কমল নয়ন দিয়ে ঝড়ে পড়ছে। এদিকে এ দৃশ্য দেখে রাজমাতার চোখের জল বন্ধ হয়ে গেল। মায়ের ঐ ব্যথিত মূর্ত্তি দেখে তিনি মুহূর্তের মধ্যে স্থৈর্য্য ফিরে পেলেন। মা তাঁর দুঃখ যেনো নিজ শরীরে টেনে নিলেন। এই হলো "পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।" তারপর নানা কথাবার্তা হলো। তাঁকে বেশ শান্তভাবে কথাবার্তা বলতে দেখলাম। মা বললেন, "তোরা ওঁকে খাবার জায়গায় নিয়ে যা।" ওঁকে নিয়ে এসে আমি প্রশ্ন করলাম, "মার কাছে এসে কি আপনার মন শান্ত হয়েছে?" উত্তরে তিনি বললেন, "বহুশোক পেয়েছি, এই নিদারুণ শোকের পর আমি পাগলের মতো ঘুরছি মার জন্য, মাকে কাছে পাচ্ছি না। মা বিন্ধ্যাচলে আছেন শুনে আজ ছুটে এসেছি। আমার মনে হচ্ছে আমার বুকের একটা পাথর উঠে গেল। আমার হাল্কা বোধ হচ্ছে।" স্তব্ধ বিস্মিত হয়ে দেখলাম উনি পেট ভরে খাচ্ছেন এবং বলছেন, "অনেকদিন পর আজ আমি ভালো করে খাচ্ছি।"

এই আমাদের আনন্দ স্বরূপিনী মহামায়া মা! মায়ার মধ্যে তিনি রেখে দিচ্ছেন আবার মায়ার পরপারে যাবার চাবিকাঠিও যোগ্যতা অনুসারে দিচ্ছেন।

আর একটি শোকার্ত্ত ঘটনা দেখেছিলাম। কলকাতায় নির্মলবাবুর বাড়ী ভাগবত সপ্তাহে মা এসেছেন। মাকে প্রথম দর্শনের দু'দিন পর এ ঘটনা দেখি। একটি অল্পবয়সী মেয়ে আকুলভাবে কাঁদছে। সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওর স্বামী Pilot ছিলেন। Plane crash -এ মারা গিয়েছেন। মার কথা শুনে পাগলের মতো ছুটে এসেছে। ওর কান্না থামে না। খুব ভিড়। মা ভিড়ের মধ্যে এসে ওর বুকে মায়ের মাথাটা চেপে ধরলেন। মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মেয়েটি হতচকিত হয়ে কান্না থেমে গেল। মা তখন ওকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিলেন। পরের দিন মেয়েটিকে একেবারে স্বাভাবিক দেখলাম। আমাকে বললো, "জানেন আমার বুকটা হাল্কা হয়ে গিয়েছে।" এই পরশপাথর মা সকলের সব দুঃখ কষ্ট নিমেষে দূর করে দিতেন।

মাকে আমরা ভক্তবৃন্দ সর্বদাই উত্ত্যক্ত করতাম। মা কখনও রাগ করতেন না। আগরপাড়ায় একটি মেয়ে মাকে কি যেনো বলতে চাইছে অথচ বলছে না। মা বারবার বলতে বলছেন, "সে বলছে আপনি রাগ করবেন।" উত্তরে মা বলছেন, "এই শরীরটা কখনও কারও উপর রাগ করে না।" গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "ন মেদ্বেষ্যোহস্তি ন মে প্রিয়।" এই কথাটাই তখন মনে হলো। শত শত সন্তান মাকে প্রতিনিয়ত বিরক্ত করছে, কিন্তু মা কি মিষ্টি ভাষায় প্রতিটি সন্তানের সঙ্গে ব্যবহার করতেন, এ শিক্ষা অনুকরণীয়। ভক্তমন্ডলীর ব্যবহারে কেউ রাগত, কেউ ক্রন্দনরত, কেউ বীতশ্রদ্ধ, তবুও যেই মা এলেন তারাই ছুটলো মাতৃদর্শনে। যদি মার কাছে থেকে ভালো ব্যবহার না পেতো এরা হয়তো জীবনেও এ পথে আসতো না। আনন্দ স্বরূপিনী মা কাউকে নিরানন্দে থাকতে দেন না। এই স্বর্গীয় আনন্দের লোভে সকলে মধুমক্ষিকার মতো মায়ের পেছনে ছুটতো। কেউ রূঢ় ভাষায় কথা বললে মা বলতেন, "মিষ্টি করে কথা বল।" এই মিষ্টভাষা ব্যবহার করে সাংসারিক লোক বহু দুঃখ জ্বালা অতিক্রম করতে পারেন।

সবশেষে মার কাছে প্রার্থনা জানাই, মা আমরা তোমার অবোধ সন্তানরা তোমার লোকাচারের সামান্যতম গুণাবলীও যেনো অর্জন করে মনুষ্য জন্ম সার্থক করতে পারি। জয় মা।

অমৃত বার্ত্তা, বর্ষ ৪, জুলাই ২০০০, সংখ্যা ৩

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

স্মরণের দর্পণে

কৃপাসিন্ধুর পাড়েবসে আছে নুনের পুতুল। কৃপাসিন্ধুতে ডুব দিয়ে রত্ন আহরণ করা যে তার পক্ষে অসাধ্য, সে বিষয়ে সে অবহিত। ছোট্ট একটা পাত্র হাতে নিয়ে সে কৃপাসিন্ধুর পাশে এসেছে, পাত্রে আবার নোনা লেগে ছিদ্র হয়ে গিয়েছে, তবুও যে তাতে কৃপাবারির ছিটেফোঁটা লেগেছিল, তাই সে বিতরণ করতে যাচ্ছে। স্থান বিন্ধ্যাচল ২৫/১২/৬৫।

মাতৃকৃপায় বিরাট রোগমুক্তির খবর জেনে, মা আমাকে বিন্ধ্যাচলে মাতৃসঙ্গ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই নির্দেশে আমার আদরের গোপালজীর ২৫ শে ডিসেম্বর (বড়দিন) বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে, মার কাছে বিন্ধ্যাচলে গিয়েছিলাম। সেই সময় সমুদ্রপারের এক সাহেব সেখানে মাতৃদর্শনে গিয়েছিলেন।

মায়ের কোলে গোপালকে বসিয়ে আমরা ইচ্ছামতো মাকে পূজো করলাম, খাওয়ালাম, আরতি করলাম। মা খুব প্রসন্নভাবে সব গ্রহণ করলেন। বিন্ধ্যাচলে তখন ভিড় বেশী ছিল না। আমি পূজো করার সময় সাহেব মার ঘরে বসেছিল। পূজোর পর মা সাহেবকে বললেন— 'বিগ্রহ পূজা যে দেখলে তার অর্থ কারোর সাকার আরাধনা, কারোর নিরাকার আরাধনা। এ দুটোই একই জিনিষ। যেমন জল আর বরফ। যার যা রাস্তা তা জ্ঞানই হোক বা ভক্তিই হোক, দুটোর লক্ষ্যস্থল কিন্তু একই। যে নিরাকার ধ্যান করে তার সাকার রূপ এই বিগ্রহ। লক্ষ্য দু'জনেরই এক।'

আশ্রমের একজন মহাত্মা মায়ের কথা ইংরাজীতে সাহেবকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

সাহেব— আমি বুঝেছি। মাকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন যে আমি যখন ধ্যান করি তখন দেখি আমার শরীর নেই আমি শূন্য, যেমন আয়নায় দেখা যায় শরীর আছে অথচ সেই শরীর আমার প্রতিবিম্ব, সেইরকম। ধ্যানে আমি অনুভব করি যে আমি শূন্যে। শরীরের অনুভূতি থাকে না। অথচ আমি যেন সাক্ষীরূপে প্রত্যক্ষ শরীরকে দেখি।

মা— ধ্যান যখন খুব গভীর হয়, তখন এই অবস্থা হয়।

সাহেব— রং আলো অতি উজ্জ্বল দেখি। দুনিয়ার সমস্ত জিনিষই অতি সুন্দররূপে দেখি। ধ্যানের পর জাগতিক বস্তুতে দৃষ্টি যখন পড়ে তখন প্রতিটি জিনিষ অধিকতর

আলোময় উজ্জ্বল বোধ হয়।

মা— সংসারের সব জিনিষ তাঁর আভাসমাত্র। পরমার্থের পথে যে অগ্রসর হয় তার চোখে সবই অতি সুন্দর লাগবেই। পরম সুন্দরের পথে যে যাত্রা করে তার ঐরকম সৌন্দর্যের অনুভূতি হয়। কারণ পরম সুন্দরের রূপের প্রতিফলন এই জগৎ। ডাকবাংলো বা যেখানেই হোক ধ্যান করো। যতোই ধ্যান গভীর হবে সকলেরই তার অংশ মিলবে। যেমন মানুষ, বস্ত্র-অন্ন দান করে এও তেমনি ধ্যান দান করবে।

সাহেব— আমি মায়ের দয়া অনুভব করেছি। আমি যতোটা দিতে না পারছি, তার চাইতে অনেক বেশি পাচ্ছি।

মা— আত্মা তো একই, কাজেই ধ্যান করলে সকলেই তার অংশ গ্রহণ করে। যেমন দুধ, বায়ু, জল, সর্বক্ষেত্রে, সর্বদেশে একই। ওর কোনো পৃথক জাতি নেই। সেইরকম এই শরীরের কাছে কোনো পৃথক ভাব নাই। সবই এক, বিদেশীর প্রশ্ন নেই। কেউই নূতন নয়। দূর নয়। দুই নিয়ে দুনিয়া, দ্বন্দ্ব অভাব এই জন্যই সুখ দুঃখ। যেখানে একত্বের ভাব সেখানে এই ভাব নেই। সেখানে সকলে সুখী, আপন।

মায়ের কিছু বাণী নোট করে রেখেছিলাম সেই অমূল্য সম্পদ ভক্তদের হাতে তুলে দিলাম।

স্থান— দেওঘর, শ্রী শ্রী নরেন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারীজীর আশ্রম - ১৯৭৭ সন।

প্রশ্ন— প্রারব্ধ কি করে কাটে?

মা — গুরুর উপদেশ পালন, শ্বাসে শ্বাসে নাম।

প্রশ্ন— গুরু ইষ্টের কাছে আধ্যাত্মিক কথা ছাড়া সাংসারিক সুখ দুঃখের কথা বলা কি অপরাধ?

মা— প্রাণ খোলা ভাবে বলা যায়।

প্রশ্ন— অহৈতুকী কৃপা কি?

মা— কৃপা বলতে অহৈতুকীই বলে।

প্রশ্ন— কাঁচা আমি, পাকা আমি কি করে বোঝা যায়?

মা— যখন ভাত খাও, তখন পেট ভরলে অন্যে বলে দেয় না কি?

জয় মা।

স্মরণিকা ২০০০

কৃপাময়ী মা আমার সাক্ষীগোপাল

ছোটবেলা থেকেই কেন জানি জগন্নাথ দেবকে আমার খুব ভালো লাগত। গর্ভধারিণী মায়ের কাছে নানারকম গল্প শুনতাম, তাতেই আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে। মা বলতেন, "জগন্নাথ দেখা সকলের ভাগ্যে হয় না। খুব শুদ্ধ মন ও একান্ত শরণাগতি নিয়ে না যেতে পারলে তাঁর দর্শন হয় না। শিশুকাল থেকেই আমি জগন্নাথদেবকে ভাইফোঁটা দিতাম। মা দেখে হাসতেন, তবে তিনি কখনও মানা করেননি। বিয়ের পর স্বামীকে আমার জগন্নাথ প্রীতি ও ভাইফোঁটার কথা বলাতে, তিনি আমাকে পুরী নিয়ে যান। আনন্দ ও ভয়ের মিশ্রণে তখন আমার এক অবর্ণনীয় অবস্থা। আনন্দ-আমার বহু আকাঙ্খিত প্রাণের ঠাকুর, আমার আদরের জগাভাইকে দেখবো বলে; ভয়—যদি ঠাকুরের পরিবর্তে অন্য কিছু দেখি, ঠাকুর প্রসন্ন না হলে নাকি দর্শন হয় না শুনেছি। যাইহোক, সমুদ্রে স্নান করে ঠাকুরের নাম জপ্ করতে করতে মন্দিরে তো ঢুকলাম। জগন্নাথ দেবের সামনে পান্ডা আমাকে বললেন, "মা দেখ, রত্নদেবীর উপর ঠাকুর বসে আছেন। মা তুমি স্পর্শ কর।" আমি তিন ঠাকুরকে সামনে থেকে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করলাম। বিশেষ করে জগন্নাথ দেবকে অনেকবার স্পর্শ করলাম। ছবিতে যে-রূপ, তাই দর্শন করলাম। কিন্তু তারপর আমি কয়েকবার পুরী গিয়েছি, দেখেছি রত্নদেবীর উপর ঠাকুর বহুদূরে। হাতের নাগালের বাইরে। পাশ থেকে স্পর্শ করা যায়। ঁমায়ের আর্শীবাদে সে স্পর্শের আবেশ বোধ হয়, জন্ম-জন্মান্তর প্রাণে জড়িয়ে থাকবে। যাক, এই গেল প্রথম দর্শন।

১৯৬৫ সনে রথযাত্রায় পুরী যাব বলে স্বামীর কাছে অনুরোধ জানালাম। তিনি আপত্তি জানালেন না। শ্রীমা তখন রাচীতে ছিলেন, আমি মাকে চিঠি দিয়ে আর্শীবাদ প্রার্থনা করলাম। কারণ, প্রথম দর্শনের কয়েক বছর পরে আমি ঁমায়ের কৃপা পেয়েছিলাম। ঁমা উত্তরে জানালেন, তিনি খুব খুশী হয়েছেন, সেই চিঠিতে চিত্রাদি লিখলেন মা রথযাত্রায় এবার পুরী যাচ্ছেন। শুনে দারুণ আনন্দ, রথযাত্রা ও মাতৃসঙ্গ একসাথে হবে। এতো আমার কল্পনার বাইরে। এ মায়ের বিশেষ কৃপা বলে অনুভূত হলো। মায়ের লীলার এবার কিছু বর্ণনা দেব — "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"। এতো প্রতিপদে বোঝা যায়। নানারকম পারিবারিক বিভ্রাটের মধ্যে দিয়ে মাতৃনাম

জপ করতে করতে ট্রেনে তো উঠলাম। T.A.B.C. Injection. Certificate গুলো নিতে হলো। রথযাত্রা ছিল ৩০-শে জুন, ১৯৬৫ সন, ১৫-ই আষাঢ়। আমরা ২৮-শে জুন পৌঁছালাম। সমুদ্রে স্নান করে মাতৃদর্শনে গেলাম। জননী স্মিত হাস্যে কুশল প্রশ্ন করে সব দুর্ভাবনার মেঘ এক মুহূর্তে সরিয়ে দিলেন। তাঁর সেই স্নেহবর্ষী কৃপার দৃষ্টি মনে যেনো অপূর্ব শান্ত রসের সঞ্চার করলো। বললেন, "কোথায় উঠেছ?" আমি বললাম, "হোটেলে, এখানে ছোট জায়গা তাই সাধু সন্ন্যাসীদের অসুবিধে করে আমাদের গৃহীদের থাকা ঠিক নয়। আমরা কাছেই Sea View Hotel-এ আছি।" প্রসন্ন হাস্যে মা বিগলিত হলেন। রথে যাব বলে, আমি বহু দোকান ঘুরে একখানা হলুদ রঙের লালপাড় রেশমী শাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম। রথযাত্রায় আগের দিন মঙ্গলবার আমার মঙ্গলচণ্ডী মায়ের পূজোর প্রশস্ত দিন বলে, আমি মাকে পূজো করার আকাঙ্খা জানালাম। মা, তা অতি প্রসন্ন মনে গ্রহণ করলেন। হলুদ শাড়ী, ফুলের সাজে মা'র অপূর্ব রূপ ফুটে উঠলো। পূজো আমার সার্থক হল। প্রসন্ন মনে মাতৃদর্শন করছি, ছবি নিচ্ছি, হরি বাবার কীর্তন শুনছি। হরি বাবাকে কিছু প্রণামী দেব মাকে বললাম, "মা, আমার লজ্জা করে, তুমি দিয়ে দাও।" মা বাবার কাছে আমাকে নিয়ে বললেন, "ওর নাকি তোমাকে প্রণামী দিতে লজ্জা করে।" তারপর আমাকে দিতে বললেন। হরিবাবা সহাস্যে খুশী মনে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। মা জননীর চরণপ্রান্তে বসে সাধু-মহাত্মাদের মুখে হরিকথা শোনা এ যেন পরম সৌভাগ্য। মঙ্গলবার মাকে পূজা করে জগন্নাথদেবকে দর্শন করতে গেলাম। এতদিন তাঁর নাকি জ্বর ছিল। স্নানযাত্রায় স্নান করে, পাঁচন খেয়ে চেহারা বড়ো রুগ্ন মনে হলো। হৃষ্ট চিত্তে দর্শন করে সাজানো রথ দেখলাম। লাল ও হলুদ রঙের কাপড় দিয়ে রথ সাজানো। তখনই আমার মনে হল, অন্যবার লাল শাড়ী পছন্দ করি। এবার হলুদ ও লাল মেশানো শাড়ী এনেছি জগন্নাথের কৃপাতেই। মাকে সব বললাম, মা হাসলেন। তারপর মাকে বললাম, "মা, আমার প্রাণের একান্ত ইচ্ছা রথের দড়ি টানার।" মা বললেন, "আমাদের সাথে গিয়ে বসলে তা তো পারবে না।" মাকে ছেড়ে অন্যত্র বসতেও প্রাণ চায় না। স্বামীও অন্যান্য ভক্তদের সাথে রথের দিন মায়ের আগেই আমরা রওনা হয়ে গেলাম। জননীর অফুরন্ত কৃপার ফলে অতো ভিড়ের মধ্যে কি করে তাঁর আসনের অতি নিকটে চলে এলাম তা ভাবলে শিহরিত হতে হয়। একটা বাড়ীর দোতালা আশ্রম থেকে নেওয়া হয়েছিল। মা একটা চৌকিতে বসে আছেন, কাছাকাছি দিদিমা ও হরিবাবা বসে আছেন। সে এক অপূর্ব পরিবেশ। ছবিদি মা'র সামনে কীর্তন করছে। চতুর্দিকে কীর্তন হচ্ছে, এদিকে মন্দিরের পান্ডা ও সরকারী লোকেদের মধ্যে বচসা, মারামারি হবার জন্য ঠাকুর রথে আসছেন না।

সকলের মন উৎকণ্ঠা, উদ্বেগে ভরপুর। মা নানাভাবে আনন্দ করে সকলকে প্রফুল্ল রাখছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথমে বলরাম রজ্জু বন্ধনে হেলেদুলে রথে উঠলেন। ঠাকুরকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে রথে তোলা হচ্ছিল তা দেখে মনটা আমার ভারী খারাপ লাগছিল। ভাবছিলাম ভক্তের জন্য ভগবানের একি কষ্ট! দড়ি বেঁধে যখন রথে তোলা হয় বুকটা অস্থির করে। এইভাবে সুভদ্রা দেবী উঠলেন। সর্বশেষে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে আমার জগাভাই গট্‌গট্‌ করে মুকুট দুলিয়ে আসছেন দেখে আনন্দে মনটা নেচে উঠলো। গুরুচরণে বসে জগন্নাথদেব দর্শন, সে একটা অপূর্ব অনুভূতি। কিন্তু ঐ কষ্ট দিয়ে রথে তোলার সময় মনটা বেদনায় ভরে উঠলো। লীলাময় ভগবানের সে এক অপূর্ব লীলা। ভক্তের জন্য কষ্ট স্বীকার তিনি সর্বদাই করছেন। মা ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকেন, ভক্তদের আনন্দ দেবার জন্য। এক ফোঁটা বিশ্রাম নেই।

তারপর রাজা এসে তাঁর করণীয় কাজ করলেন। রথের প্রাঙ্গণ সোনার ঝাঁটা দিয়ে মার্জন করলেন। কিন্তু সন্ধ্যা হবার জন্য ঐ দিন আর রথ চললো না। অনেকে দুঃখ করতে লাগলেন। আমার কিন্তু আনন্দ হলো, আগামীকাল রথের দড়ি টানতে পারব বলে। মাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম। রাতটা উদ্বেগে কাটলো। সকালে আশ্রমে যেয়ে শুনি মেয়েরা আজ সাধুদের সঙ্গে রথ দেখতে যাবে, মা যাবেন না, তাই ওদের সঙ্গে আমরাও রওনা হলাম। আমার স্বামী ক্যামেরা নিয়েছিলেন। মন্দিরের সামনে গিয়ে দেখি জনতার সমুদ্র। বলরাম দেবের রথ রওনা হয়ে গিয়েছে। তারপর সুভদ্রাদেবীর রথ যাচ্ছে। আমরা প্রথমে তাঁর রথের দড়ি একটু টানলাম। আমার নজর জগন্নাথ দেবের রথের উপর। তারপর বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রওনা হলো জগন্নাথদেবের রথ। ফল ফুল, সকলে ছুঁড়ে দিচ্ছে। একবার দড়ি টানতেই ভিড়ের চোটে সরে এলাম। তারপর আশ্রমের সকলে ফিরে গেলেন। আমি আমার স্বামীর সাথে জগন্নাথদেবের রথের সঙ্গে সঙ্গে চললাম। আমি ছবি তুলছি দেখে এক ভদ্রলোক বললেন, "আপনি এগিয়ে যান না।" মাতৃকরুণা কিভাবে কাজ করে ভাবলে অবাক লাগে। দেখছি সকলকে পুলিশ তাড়িয়ে দিচ্ছে। একটি মেয়েও রথের কাছাকাছি নেই। মাতৃকৃপায় কি না সম্ভব। ভয়ে ভয়ে ক্যামেরা হাতে এগিয়ে যাচ্ছি, একজন পান্ডা হঠাৎ আমাকে ডেকে নিলেন। একেবারে রথের সামনে থেকে আমি ছবি নিলাম। অদ্ভুত আনন্দ উত্তেজনায় আমি যেনো কেমন হয়ে গেলাম। লুটিয়ে পড়ে রথের চাকায় প্রণতি জানালাম। এরমধ্যে film শেষ হয়ে গেল। পান্ডার মতো একজন বললেন, "কাছেই দোকান আছে।" রথ টানার পর বিশ্রামের জন্য কিছুক্ষণ করে রাখা হয়। সেই সুযোগে আমার স্বামী film ভরতে গেলেন। আমি দড়ি টানতে টানতে

চললাম। film ভরে আমার স্বামী ফিরে এলেন। কি করে অতো ভিড়ে এসব ঘটছে বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ সে যে কি অসম্ভব ভিড় তা বর্ণনা করা যায় না। মাঁয়ের অসীম কৃপায় পুলিশ, পান্ডা সকলে আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করছেন। মুখ্য পান্ডা আমাকে ডেকে জগন্নাথদেবের কাপড়ের টুকরো, প্রসাদী তুলসী, ফল ইত্যাদি দিলেন। কি অসাধারণ মাতৃকৃপা! আমি ভালো ছবি তুলি না, ক্যামেরাও দামী নয়, সব ছবিও ওঠেনি। তিনখানা ছবি ভালো উঠেছিল মাঁকে দেখিয়েছিলাম। মা বললেন, "খুব সুন্দর হয়েছে।" আনাড়ী হাতে কি করে ছবি উঠলো জানি না। মা-ই জানেন। অন্তবিহীন এ করুণা ধারায় স্নাত হয়ে আমরা মাসীর বাড়ীর কাছাকাছি রথের দড়ি ধরে এলাম। তারপর আমরা আশ্রমে ফিরে মাকে সব কথা বললাম। মা বললেন, "খু-উব ভালো কথা।" এইভাবে মা আমার একান্ত বাসনা পূর্ণ করলেন বলে মনটা আনন্দ ভরে গেল।

রথের পরদিন আমরা দু'জনে ভুবনেশ্বর দর্শন করতে গেলাম। এদিকে আমার স্বামীর একান্ত ইচ্ছা, সাক্ষীগোপাল দর্শন করা। মায়ের কাছে গেলে এতোসব দর্শন করার আগ্রহ আমার থাকে না, মার কাছেই ঘোরাঘুরি করি। প্রধান মন্দির দর্শন করি। আমি যাব না বলাতে উনি দুঃখিত হলেন, ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে এসে মাকে প্রণাম করে বললাম, "মা, তোমার বাবা শুধু সাক্ষীগোপালে যেতে বলছে, আমি বলেছি, "আমার মা-ই আমার সাক্ষীগোপাল, কাজেই আমি মার কাছে থাকব, তুমি একলা দর্শন করে এসো।" মা শুনে হেসেই অস্থির। আবদারের সুরে আহ্লাদে গোপালের মতো মুখভঙ্গী করে আমাকে বললেন, "যাও না মা-বাবার সঙ্গে, বাবা যা বলে তা শোনো।" "আমি তবুও বলি, "মা তুমিই আমার সাক্ষীগোপাল।" তারপর কথা ঠিক হলো মা রবিবার ৪-ঠা জুলাই যখন শ্রী প্রভু দত্ত ব্রহ্মচারীজীর নেমন্তন্ন রক্ষা করতে সকালে ভুবনেশ্বর যাবেন আমরাও তখন সাক্ষীগোপাল দর্শন করে আসব। ঐদিনই রবিবার বিকেলে আমাদের কলকাতা ফেরার টিকিট ছিল। শনিবার রাত্রে জগন্নাথদেবের প্রসাদ মাকে সকলের খাইয়ে দেবার কথা শুনলাম। মা সন্ধ্যাবেলা সাধুদের নেমন্তন্নে কোথায় যেনো গিয়েছিলেন। আমরা hotel থেকে দু'বার গেলাম, মা তখনও ফেরেননি। সকলে বললো, পান্ডা খবর দিয়েছে প্রসাদ আজ পাওয়া যাবে না। কাজেই আমরা বিষন্নমনে হোটেলে ফিরে গেলাম। পরদিন সকাল ৮ টার মধ্যে মা বেড়িয়ে যাবেন শুনলাম। পরদিন সকাল ৭টায় দু'জনে আশ্রমে পৌঁছালাম। অপেক্ষা করে যাচ্ছি, মা বেড়োচ্ছেন না। অন্যদিন মা তাড়াতাড়ি বেরোন শুনলাম। ১০ টা বাজতে চললো, মা বেড়োচ্ছেন না। তার উপর শুনলাম গতকাল রাত্রে প্রসাদ

এনেছিল। সকলে মাকে খাইয়েছেন, মাও সকলকে খাইয়ে দিয়েছেন। এভাবে আনন্দমেলা বসেছিল। তখনই মনটা অভিমানে ভরে গেল। পরমানন্দ স্বামীজী বললেন, "মায়ের ইচ্ছা হলে ব্যবস্থা হবে, বসে থাক্।" বেলা ১০ টায় মার দরজা খুললো। প্রণাম করে বললাম, "মা, তুমি চলে যাচ্ছো। আর হয়তো দেখা হবে না। সন্ধ্যার গাড়ীতে কলকাতা রওনা হব। কাল তো তোমাকে খাওয়াতে পারলাম না।" দিদিমা অপেক্ষা করার জন্য ইশারা করলেন। ছবিদি প্রসাদী পান্তা মেখেছে। রূপোর বাটিতে চামচ দিয়ে বিমলাদি তাই মাকে খাইয়ে দেবার জন্য দিলেন। আমি ভয়ে ভয়ে একটু প্রসাদ মায়ের শ্রীমুখে তুলে দিলাম। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "দই দিয়া মাখছে নাকি?" বলতে পারলাম না। আমার স্বামীকে বললাম, "মাকে খাইয়ে দিতে।" সে ভয়ে অস্থির। কোনোমতে এক চামচ মায়ের মুখে তুলে দিল, আমি আরও দু'বার মুখে দিয়ে দিলাম। জননী খুশী হয়ে বললেন, "এই তো হলো, এবার প্রসাদটা তোমরা দু'জনে খেয়ে ফেলো।" তখন ক্ষিদেও লেগেছে খুব, মহানন্দে সেই মহাপ্রসাদ দু'জনে খেয়ে নিলাম। অপূর্ব তার স্বাদ। প্রাণ জুড়িয়ে গেল। এভাবে আমার মনোবাসনা পূর্ণ করে কৃপাময়ী মা বেরলেন সদলবলে। তিনটে মোটর মার তদারকিতে ভর্তি হল। মা, পুষ্পাদি, চিত্রাদি, রাজাবহিন, উদাসজী, স্বামীজীসহ একটা গাড়ীতে উঠলেন। কে কোন গাড়ীতে যাবে, রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে জননী সব ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের কিছুই বললেন না। মনে মনে আশা, একবার যদি বলেন তো সঙ্গে যাই। আমরা প্রণাম করে বললাম, "মা, হয়তো যাবার সময় দেখা হবে না। বিকেলের ট্রেনে যাব।" মা বললেন, "দ্যাখো কি যোগাযোগ হয়।" ভুবনেশ্বর আমরা দর্শন করে এসেছি। কাজেই নিজ থেকে বলতে সাহস হলো না। সাক্ষীগোপাল যে ও পথে পড়বে তাও মনে নেই। সতৃষ্ণ নয়নে সকলের যাত্রা দেখছি। দেখলাম গাড়ীগুলো চলে যাবার পর আশ্রমের সাধু, শম্ভুদা ও অন্যান্য কয়েকজন সাধু ও ভক্ত অপেক্ষা করছেন। শুনলাম তাঁদের জন্য আর একটা গাড়ী আসবে। ভাবছি ওঁরা সঙ্গে নিলে সাক্ষীগোপাল তবু দর্শন হতো। আমি বললাম, "আমরা সাক্ষীগোপাল দর্শনে যাব, মন্দির কতক্ষণ খোলা থাকে?" ওঁরা বললেন, "এখন ১১টা বেজে গেছে, বেলা ১২টায় মন্দির বন্ধ হবে। তোমরা এখন গেলেও দর্শন পাবে না।" ওঁদের গাড়ীতে নেবার কথা কিছু বললেন না। আমরাও আর কিছু না বলে হেঁটে রওনা হলাম। মার বাবা-তো আমার উপর চোটপাট আরম্ভ করলো, "তোমার জন্য সাক্ষীগোপাল দর্শন হলো না। সাক্ষীগোপাল দর্শন না হলে জগন্নাথ দর্শনের ফল হয় না, ইত্যাদি অনেক কথা। কি যে মাকে হাঁ করে রাতদিন দ্যাখো! তোমার আর আকাঙ্খা মেটে না।" তখন মায়ের উপর অভিমানে আমার বুক বন্ধ হয়ে আসছে আমার চোখের জল

চোখে মেরে বললাম, দ্যাখো আমি তো মাকে নরদেহবাহী বলে মনে করি না। গুরু ইষ্ট অভেদ বলে বিশ্বাস করি। তুমি একবার বিশ্বাস করে দ্যাখো না। রেগে বললো রিক্সা করে বাস স্ট্যান্ড যেয়ে বাসে রওনা হলে কিছুতেই দর্শন হবে না। আমি বললাম, "মন্দির হোক না বন্ধ, দূর থেকে প্রণাম করবো।" কিছুতেই রাজী হয় না। অনেক অনুরোধ করার পর একটা রিক্সা নিয়ে রওনা হলাম। পথে বললাম, "তুমি শুধু মাকে একবার বিশ্বাস করেই দ্যাখো। মায়ের কৃপায় কি যে হতে পারে বলা যায় না।" কিছুদূর যেয়েই দেখি একটা মোটর দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি হতেই দেখি মা জননী। দেখেই তো রিক্সা থেকে লাফ মেরে নেমে পড়লাম। আবার বকুনি। এতো দেখলে তবুও হলো না। আর দেরী করলে কোনো মতেই সাক্ষীগোপাল দর্শন হবে না।" বললাম, "মাকে তো সাক্ষীগোপাল দর্শনে যাচ্ছি বলা হয়নি। মাকে বলে গেলে দর্শন হতে পারে। তাছাড়া মাই তো আমাদের সর্বস্ব। মাকে ফেলে ঠাকুর দেখে কোনো ফল হবে না, এ যুক্তির উপর কথা নেই। কাজেই আমার সঙ্গে সঙ্গে মাকে প্রণাম জানাতে চললেন। মার গাড়ীর কাছে গিয়ে বললাম, "মা আমরা সাক্ষীগোপাল যাচ্ছি।" মা বললেন, "কিসে যাচ্ছো?" বললাম, "রিক্সা করে বাস স্ট্যান্ড যাচ্ছি, ওখান থেকে বাসে যাব।" মা স্বামীজীকে আগের গাড়ীগুলোতে কে কে আছে জিজ্ঞাসা করলেন। " স্বামীজী বললেন, "একখানা বাস অবশিষ্ট সঙ্গীদের আনবার জন্য আশ্রমে গেল। জায়গা হলে ওদের উঠিয়ে দেব।" আমরা সংশয়ের দোলায় দুলছি, কি হবে জানি না। করুণাময়ীর আর্শীবাদে ঐ বাসে আমাদের স্থান হলো। হাতে যা পয়সা উঠলো রিক্সাওয়ালাকে দিয়ে ছুটে বাসে উঠলাম। শুনলাম মা বললেন, "সব গাড়ী আগে যাক। এ শরীরের গাড়ী পরে যাবে।" সাক্ষীগোপাল আসার অনেক আগে মার গাড়ী আমাদের গাড়ীর আগে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। সাক্ষীগোপাল ষ্টেশনে রাস্তার উপর আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল। এমনি কয়েকদিনের দৌড়াদৌড়িতে শরীর ভয়ানক ক্লান্ত। তার উপর মা চলে গেলেন, অবসন্ন দেহ-মন নিয়ে সাক্ষীগোপালের পথে পা বাড়ালাম। মেটে রাস্তা, অনেকটা হেঁটে যেতে হবে। পা চলছে না, হঠাৎ দেখি একটা বাস যাচ্ছে। আশ্রমের বাসটাকে হাত দেখাই, ওরা থামে না। ওদেরও তখন প্রাণ অস্থির, আমরা জানব কি করে? শেষকালে শম্ভুদা যেই আমাদের দেখেছেন বাস থামার জন্য আদেশ দিলেন। দৌড়ে দৌড়ে অনেকটা পথ গিয়ে বাসে উঠলাম। ওঁদের এপথে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বললেন, "ওঁরা কিছুদূর যাবার পর ড্রাইভার নাকি বললো মার গাড়ী নাকি সাক্ষীগোপালের রাস্তায় গিয়েছে। যেই শোনা ওঁরাও ঐপথে ফিরেছেন। আমার তখন আনন্দে চোখে জল এসেছে। শম্ভুদাকে বললাম, "আমি মাকে বলেছিলাম তুমিই আমার সাক্ষীগোপাল।

মা, শুনে হেসেছিলেন।" শম্ভুদা শুনে বললেন, "দিদি তোমার জন্যই হয়তো মা এসেছেন।" আমি বললাম, "কি জানি!" তারপর সাক্ষীগোপাল নেমেই দেখি মন্দিরের বাঁধানো সিঁড়িতে বসে স্বয়ং জগৎজননী। স্বামীর কথাও মনে থাকল না। পদ্মের মালা দেখে মালাওয়ালাকে পরে পয়সা দেব বলে একটা মালা নিয়ে প্রথমেই মায়ের শ্রীচরণে দিলাম, মা বললেন, তাড়াতাড়ি যাও দর্শন করতে, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে।" ছুটে মন্দিরে ঢুকলাম। অন্ধকারে দেখতে পারছি না। মন্দিরে ঢুকে দেখি আমার স্বামী ডাকছেন দু'টো মালা হাতে নিয়ে। বললাম, "মাকে শিগগির প্রণাম করে এসো।" বললেন, "প্রণাম করে মালা দিয়ে এসেছি।" আমাকে মা যা বলেছেন ওকে তাই বলেছেন। তখন নিশ্চিন্ত মনে সাক্ষীগোপাল দর্শন করলাম। ইনি গোপাল মূর্তি নন। কৃষ্ণমূর্তি, অপূর্ব মুখশ্রী, অদ্ভুত চোখ দুটি, মনে হয় জীবন্ত ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। জননীর স্নিগ্ধ মূর্তি আর পাথরের ঐ মূর্তির অনবদ্য রূপ। দুই-ই আমার মনপ্রাণ ভরিয়ে দিয়েছে। পান্ডার হাতে মালা, দক্ষিণা দিয়ে ছুটে এসে দেখি মা স্বদলবলে গাড়ীর দিকে রওনা হচ্ছেন। মাকে গাড়ীর কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। মা বললেন, "দর্শন হলো?" আমি বললাম, "খুব ভালো দর্শন হয়েছে, তুমিও এলে।" মা হাসলেন, ওদিকে মন্দির বন্ধ হয়ে গেল। গাড়ী চোখের আড়ালে চলে গেল। মন-প্রাণ অপূর্ব আবেশে ভরে রইল। শম্ভুদাদের বাস রাস্তার মোড়ে আমাদের নামিয়ে দিয়ে ভুবনেশ্বরে চলে গেল। এই হলো অঘটন ঘটন-পটীয়সী মা। মা'র কৃপা অনুভব করতে করতে ভরা মন নিয়ে ফিরে এলাম হোটেলে। মালপত্তোর বেঁধে আশ্রমে গেলাম। যদি মা ফিরে আসেন এই আশায়। আমার স্বামী বললেন, "অতো বেলায় গিয়েছেন আজ আর দেখা হবে না।" বললাম, "সাক্ষীগোপালের ব্যাপার দেখে তো বুঝলে মার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই।"

সত্যিই তাই। ঘরে ঢুকে দেখি মা একলা শুয়ে আছেন। পুষ্পদি শ্রীচরণে কর্পূর তেল মালিশ করে দিচ্ছে। আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে মার বাবাও ঢুকলেন। পুষ্পদি ঐ বিশ্ববন্দিতা চরণ দু'খানি ঢেকে দিলেন। মাকে বললাম; "তুমি দয়া করে গেলে বলে আজ খুবই ভালো দর্শন হলো।" মা বললেন, "এই শরীরটার তো যাবার কথা ছিল না। ঐ যে বলছিলা না, সেজন্য যোগাযোগটা হয়ে গেল।" শম্ভুদা কিছুটা আভাস দিয়েছিলেন। মাতৃমুখে এই বাণী নিজে কানে শুনে জীবন আমার সার্থক হয়ে গেল। মাগো, আশীর্বাদ করো যেনো তোমার শ্রীচরণে আমার বিশ্বাস চিরদিন অটুট্ থাকে।

জয় মা।

আমাদের দিদিমা

—"দিদিমা"— সামান্য এই নামের মধ্যে দিয়েই তিনি আমাদের কতো নিকটতম ও প্রিয়তম তা উপলব্ধি হয়।

মায়ের দর্শনের জন্য যখন প্রাণ আকুলি বিকুলি করছিল সেই পূণ্য মুহূর্তে প্রথমে দিদিমাকে দর্শন করি। স্থান কলকাতা, বিরাট প্যাণ্ডেল। মায়ের আসনের পাশেই দিদিমা বসে আছেন— শান্ত, স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্তি। গেরুয়া রংয়ের বস্ত্র যেন দিদিমার শ্রীঅঙ্গের স্পর্শ পেয়ে আরো উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। দারুণ ভিড়। সকলেরই স্থির দৃষ্টি মার উপরে কাজেই দিদিমার শিষ্য-শিষ্যারাও তখন দিদিমার উপস্থিতির স্বীকৃতি দিচ্ছে না। বেশীরভাগ সকলেই মাকে ফুলমালা ফল দিয়ে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে আসছেন।

মানুষ সব সময়ই শ্রেয়ের উপর লক্ষ্য রাখে না, প্রেয়ই তাদের কাম্য। ধর্মের উন্মাদনার সময়ে সময়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। মার সম্মুখে যখন প্রচণ্ড ভিড় হয় দিদিমা জড়সড়ভাবে একদিকে সামান্য সরে বসে থাকেন। অন্তর্জপ তাঁর সব সময়েই চলতো। মাকে প্রথম দর্শনের জন্য গিয়েছি কিন্তু দিদিমার ঐ শান্ত স্নিগ্ধ নির্লিপ্ত ভাব আমাকে আকৃষ্ট করল। প্রথম দর্শনেই মা যে জগজ্জননী সে ভাবটা বদ্ধমূল হয়ে আমার হৃদয়ে বসে পড়লো। আমি মনে মনে স্থির করলাম যার গর্ভে স্বয়ং ভগবতীর জন্ম তাঁকে শ্রদ্ধানত প্রণতি জানালেই তাঁর আশীর্বাদে ভগবতীর কৃপা পাওয়া যাবে। সেই অনুভূতি নিয়ে আমি প্রথমে দিদিমাকে প্রণাম করলাম। টুপ করে মাথার উপরে দিদিমার আশীর্বাদী শ্রীহস্ত এসে পড়ল— মনটা শান্তিতে ভরে গেল। তারপর মাকে প্রণাম করলাম, মার মুখে স্নিগ্ধ হাসি। ঠিক তারপরেই মায়ের অনেক অহেতুকী কৃপা আমি পেয়েছি।

তারপর বহুবার দিদিমার পূত সংসর্গে আসবার সৌভাগ্য হয়েছে। আমি কখনও দিদিমাকে বিরক্ত হতে দেখিনি। তাঁকে প্রণাম করলেই তিনি যে কোন অবস্থায়ই থাকুন না কেন, মাথায় মঙ্গলহস্ত স্পর্শ করে দিতেন। শুয়ে থাকলে উঠে দিতেন। দিদিমার কাছে যেটুকু প্রসাদ থাকতো তাও ভাগ করে দিতেন। একবার দেরাদুনে

সকালের দিকে দিদিমা সামান্য ফলমূল কি খাচ্ছিলেন। বিমলাদি খাবার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমরা ঘরে গিয়ে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে ভোগ থেকেই প্রসাদ উঠিয়ে দিলেন। আমরা যাবার পর আরো বহুলোক এলো। দিদিমা দেখি সকলকেই তাঁর খাবারের অংশ দিয়ে দিচ্ছেন। লজ্জায়, দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে বললাম, "দিদিমা সবই তো দিয়ে দিলেন। আপনি কি খাবেন?" দিদিমা নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন "ঐ তো হবে।" তারপর থেকে দিদিমার খাবার সময়ে আমি আর কখনও যাইনি।

আর একদিনের কথা— বৃন্দাবন ধাম। মায়ের শয়ন ঘরের সংলগ্ন মধ্যের কামরায় দিদিমা তাঁর চৌকিতে শুয়ে আছেন। আজকাল মাথায় ঘোমটা দেবার রেওয়াজ প্রায় উঠে গিয়েছে বললেই হয়। কিন্তু আমাদের পূর্বসংস্কার বশতঃ দেব মন্দিরে, সাধুদর্শনে ও অনান্য যথাযোগ্য স্থানে মাথায় কাপড় দেবার অভ্যাস। দিদিমা শুয়ে ছিলেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে মেজেতে বসে আছি। মার সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম এসময় মাথার কাপড়টা কয়েকবার পড়ে গেল। আমি ২/৩ বার উঠিয়ে দিলাম তারপর আবার যখন পড়ে গেল আমি বিরক্ত হয়ে উঠালাম না আর হঠাৎ আমি দেখি আমার মাথার কাপড়টা কে যেন মাথায় ভাল করে তুলে দিচ্ছে। আশ্রমে এ কাজ কে করবে? আমি ত অবাক হয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি দিদিমা চৌকিতে বসে আমার মাথায় কাপড় দিয়ে দিচ্ছেন। গৃহত্যাগী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী কিন্তু অন্তর-ভরা কত দরদ। কতোখানি শালীনতা বোধ। সামান্যভাবে অসামান্য তত্ত্ব বুঝিয়ে দিলেন— যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লজ্জারূপেন সংস্থিতা ....। অপ্রস্তুত হলাম সত্যি। কিন্তু ভক্তিভরে তাঁর শ্রীচরণে মাথা নুইয়ে দিলাম। স্থানকালের মর্যাদা দিতে আজকাল আমরা ভুলে যাই। দিদিমা তাই স্মরণ করিয়ে দিলেন।

আর একদিন— দিদিমা সেবা নিতে ভয়ানক কুণ্ঠিত হতেন। অথচ কারো মনে দুঃখ দিতেও পারতেন না। দিদিমাকে সেবিকা পায়ে তেল দিয়ে দিচ্ছিল। আমরাও দিদিমার পা টিপে দিতে ইচ্ছা হলো। দিদিমা অন্তরের কথা বুঝলেন। প্রথমে আপত্তি করলেন। আমিও চুপ করে বসে রইলাম। পরে ডেকে বললেন 'ইচ্ছা হৈছে একটু দাও।" কিন্তু কি সঙ্কোচ।

আর একদিন মা বৃন্দাবন থেকে কাশী রওনা হবেন। দিদিমাকে দেখি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি অর্থাৎ গুরু ও ঠাকুরের ছবি, মালা, ধর্মপুস্তক ও টুকিটাকি কাপড় চোপড় ইত্যাদি একটা পুঁটলী করে বাঁধছেন। আমি ও আর একজন এগিয়ে গেলাম

সাহায্য করতে। দিদিমা মিষ্টি হেসে বললেন, "দরকার হবে না।" এই বলে কি সুন্দরভাবে সাজিয়ে গাঁটরীটা বাঁধলেন দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম।

যদিও আমি দিদিমার মন্ত্রশিষ্যা ছিলাম না। তবুও দিদিমা আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন এবং ব্যবহারেও তা প্রকাশ করতেন। মাকে প্রথম দর্শনের পর একটি মন্ত্র ব্যাপারে দিদিমাকে প্রশ্ন করলাম। দিদিমা মাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ও পুরুষও, নারীও। ঐ সব।" আর একদিন। ছেলে বিলাত যেতে চায়। আমি মার মত ছাড়া যেতে দেব না বলে মার কাছে দেরাদুনে নিয়ে গেলাম। দিদিমা কথাটা শুনে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করার পর বাঙাল ভাষায় যা বললেন তার অর্থ হচ্ছে— "তোমার একটি ছেলে, কেন তাকে অতো দূরে পাঠাবে? বিদেশে গেলেই কি বড়ো থালে ভাত খেতে পাবে। ওর অদৃষ্টে ছোট বা বড়ো যে থালা জুট্‌বে তা নিজের দেশ থেকেই পাবে। দেশের জিনিষই খুঁটে খাক্। কখনও পাঠাইও না"। আচার বিচার সংস্কার খুব মানতেন।

মার কাছাকাছি থাকার বাসনা দিদিমা সর্বদাই পোষণ করতেন মনে হতো। কিন্তু দেখেছি মা হঠাৎ উঠে গেলেন, জনতাও মার পেছন পেছন ছুটলো। দিদিমা কতো সময় এক্‌লাই টুকটুক করে হেঁটে চলেছেন। একবার দেরাদুন শিবমন্দিরের কাছে এই ব্যাপার ঘটলো। মা উঠে গেলেন ভক্তমণ্ডলীও সব ছুটল। দিদিমা মোড়া থেকে উঠে এক্‌লা এক্‌লা রওনা হলেন মেয়েদের দোতালার ঘরের ওঠার সিঁড়ির দিকে। আমি জপে বসেছিলাম। দিদিমাকে একলা যেতে দেখে আমি জপ বিসর্জন দিয়ে তাঁর সঙ্গে হাত ধরে চললাম। দিদিমা বললেন, "দরকার নাই, তুমি জপ কর।" আমি শুনলাম না। হাত ধরে গন্তব্যস্থলে দিদিমাকে পৌঁছে দিলাম। তখন দিদিমার সারা মুখ শিশুসুলভ হাসিতে ভরে গেলো। আমার হাতে একটি মিষ্টি দিয়ে আরো মিষ্টি করে হাসলেন দিদিমা।

ঘন্টার পর ঘন্টা মার পাশে ধীর স্থির ভাবে দিদিমা বসে থাকতেন। জপ সর্বদাই চলতো। এক ভক্ত প্রশ্ন করলেন, "দিদিমা তুমি সন্ন্যাসিনী। ভগবতী কন্যাকে গর্ভে ধরেছো, তোমার এতো জপের দরকার কি?"

স্নিগ্ধ হেসে দিদিমা উত্তর দিলেন, "এ তোমাদের জন্যই।" ভবসাগর— পারের কড়ি হাতে তুলে দিয়েও দিদিমার বিশ্রাম নেই। কে কোথায় ঠিকমতো যাত্রাপথের কড়ি গুছিয়ে রাখতে পারছে না, সে চিন্তাও দিদিমাই করছেন।

এই না হলে কি জগজ্জননীর মা তিনি হতে পারতেন? মায়ের অক্লান্ত সেবা করছেন সেবিকা। মা-ই তাঁর একমাত্র ধ্যান জপ সব কিছু। কিন্তু দিদিমা যে মার মা, সে কথাও তিনি বিস্মৃত। দিদিমা মার উপরতলার থেকে নীচতলায় নেমে যাচ্ছেন। ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "ও দিদিমা তুমি কেন এতো রাত্রে নীচে যাচ্ছো?" উত্তর দিলেন ঃ "বাথরুমে যাব।" ভক্ত বললেন, "তুমি মার বাথরুমে যাও, কষ্ট করে নীচে যাবার কি দরকার?" সেবিকার ভাব নষ্ট করতে চান না দিদিমা। অত্যন্ত ধীর স্বরে বললেন, "মার বাথরুমে যাওয়া ও পছন্দ করে না।" ভক্ত জোর দিয়ে বললেন ঃ মা তোমারই তো মেয়ে, তুমি যাও। দিদিমা বললেন, "না ও বক্‌বে।" ভক্তের জেদ বাড়লো, বললেন "কি বলে তোমায় আবার বকবে?" দিদিমা মিষ্টি হেসে বললেন, "চোখ দিয়ে বকবে।"

যিনি স্বয়ং ভগবানকে গর্ভে ধারণ করেছেন, যিনি গুরুরও গুরু সেই তিনি এতো সংকুচিত হয়ে নিজেকে প্রছন্ন করে রাখতেন ভাবলে অবাক্ হতে হয়। কারোর ভাব নষ্ট করতেন না। জীবনে কোন দাবী-দাওয়া তাঁর ছিল না। গীতায় উল্লেখিত গুণাতীতের প্রতিটি লক্ষণ দিদিমাতে বিদ্যমান ছিল। আমাদের সাধারণ বুদ্ধির কাছেও তা ধরা পড়তো। তাঁর ঐ দিব্য ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণ গোপন করে সাধারণ মানবী দিদিমার মতোই তিনি থাকতেন সকলের সঙ্গে মিশে।

আজ দ্বিতীয় বার্ষিক তিরোধান তিথিতে তাঁর স্নেহের কথা মনে পড়ে মনটা ভরাক্রান্ত হয়ে আছে।

আনন্দ বার্ত্তা, বর্ষ ২০, জানুয়ারী ১৯৭৩, সংখ্যা ১

গুরু পূর্ণিমা

গুরু পূর্ণিমার রজনী উৎসব আনন্দে শেষ হলো। কিন্তু সত্যিই কি এর শেষ আছে? কেনই বা এ উৎসবের আয়োজন? প্রশ্ন জাগে মনে। উৎসবের দিন যখন পরিপাটি করে শ্রীগুরুর ছবিকে সাজালাম, তাঁর উদ্দেশ্যে ভোগ আরতি দিলাম তখন উচ্চতর কোনো অনুভূতি না হলেও মনটা স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরে গেল। কাণায় কাণায় প্রাণের আনন্দ উপচিয়ে উঠতে লাগলো। শ্রীগুরুর আলেখ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হলো, প্রসন্ন কৃপাঘন দৃষ্টিতে যেন তিনি তাকিয়ে হাসছেন। ক্ষুদ্র আধার, ঐটুকুতেই আমরা আনন্দ পাই।

মানুষ মাত্রেই আনন্দের কাঙাল। সব সময় সে আনন্দ ধরা দেয় না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ দিনে, বিশেষ মুহূর্তে যে আনন্দ লাভ, সেই সম্পদ যেন জীবন দেউলে অনির্বাণ শিখায় জ্বলতে থাকে— চলার পথকে করে আলোকিত।

পূজো শেষে পূজনীয় শিশির ব্রহ্মচারীজী নিম্বার্ক আশ্রমে নিয়ে গেলেন। আশ্রম প্রাঙ্গণ উৎসবে মেতে উঠেছে। সেই সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠেছেন ব্রহ্মচারীজী— ছোট্টখাট্টো সরল মানুষটি— যাঁর সম্বল একমাত্র গুরুভক্তি।

বুড়োবুড়ি, যুবকযুবতী সবাই যেন আনন্দের নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন। পূজো, পাঠ, ভোগ, আরতি শেষ হলো। দুপুর ১২টায় প্রসাদ পাবার পালা। একসাথে হাজার লোক বসে গেছে পাতা পেতে। হয়তো নিত্যনৈমিত্তিক এর চাইতে অনেক সরস খাদ্য অনেকেরই ভাগ্যে জোটে, কিন্তু এ অনাবিল আনন্দ তো জোটে না। কাজেই আনন্দের ভাগ নেবার জন্য আজ সকলে সমবেত হয়েছেন। কতো কষ্ট করে কতদূর থেকে সবাই এসেছেন। বসার কষ্ট, প্রসাদও হয়তো পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়, তবুও আছে অনাবিল আনন্দ। ভগবানতো আনন্দস্বরূপ। সেই রসাস্বাদনের পালাই যেন আজ চলছে। তিনি আনন্দময় না হলে এ আনন্দ এলো কোথা থেকে?

বিকেলে গেলাম সারস্বত আশ্রমে। আনন্দঘন মূর্তি নিয়ে সাধনরাজত্বে অচল স্বামীজী (পূজনীয় স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতীজী) সেখানে বিরাজ করছেন। অপূর্ব

শ্যামা সঙ্গীতের মূর্ছনায় আশ্রম প্রাঙ্গণ মৌন মুখরতায় স্তব্ধ হয়ে আছে। যিনি সঙ্গীত পরিবেশন করছেন, তাঁরও চমৎকার ভাব, আর যার উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হচ্ছে তিনি তো লোকোত্তর ভূমিতে, আনন্দময়ের নিবিড়ঘন সংস্পর্শে আনন্দহিল্লোলে ভেসে রয়েছেন।

নীরবে সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে ফিরে এলাম বাড়ীতে। জ্যোৎস্না প্লাবিত আকাশের নীচে বসে ভাবতে লাগলাম কেন এই পূর্ণিমারই নাম গুরুপূর্ণিমা হলো?

পরদিন আবারও সারস্বত আশ্রমে গেলাম। পূজনীয় স্বামীজীকে প্রশ্নটা করলাম। লীলাময়ের নিত্যলীলার সঙ্গী আনন্দময় স্বামীজী। পাণ্ডিত্যের গভীর অধিষ্ঠানে নির্লিপ্ততায় বসে আছেন তিনি। আনন্দের পরম উপলব্ধিতে তিনি সর্বদাই স্বল্পভাষী। সব চাইতে মজা হচ্ছে এই যে, যদিও তিনি পাণ্ডিত্যের সাগর, উপলব্ধির জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অথচ আমাদের মতো নালা ডোবা যখন হৃদয়ের প্রেরণায় তাঁর কাছে উপস্থিত হয় তখন তিনি কিন্তু বিপুলতার জগৎ থেকে নেমে আসেন নালাডোবার সান্নিধ্যে। পরিচ্ছন্ন সুন্দরভাবে প্রশ্নকর্তার আধারের উপযোগী করে তাকে বুঝিয়ে দেন তার প্রশ্নের উত্তর। কাজেই গুরুপূর্ণিমা সম্বন্ধে যা লিখবো তাতে যদি পণ্ডিত পাঠকমণ্ডলী খুশী না হন সেটা প্রবন্ধের লেখিকারই একটি বিচ্যুতি। সারমর্ম যেটুকু পাবেন তা স্বামীজীর কথারই ছায়ামাত্র। ঐ অসাধারণ পণ্ডিত সাধকশ্রেষ্ঠ মহাত্মার বাণী ভাষায় রূপ দেবার অক্ষমতা আমি স্বীকার করছি।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি গুরুরূপে পৃথিবীতে বিরাজ করেন। জীবের আগ্রহশক্তি যখন সেই অনুগ্রহ শক্তির সঙ্গে মিলিত হয় তখনই হলো প্রকৃত গুরুকরণ বা দীক্ষা। ভগবান সদাসর্বদা তাঁর অনুগ্রহ বিলিয়ে যান কিন্তু জীবের মুখ ফেরানো হয়েছে তাই সে তা ধরতে পারে না। সোজাদিকে মুখ ফেরালেই সে তার উপলব্ধি করতে পারে। গুরুবীজ "ঐ"। এ বীজ বলে, "রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন পাবার আশায়।" তলের gravity কাটিয়ে এই বীজ পরিপূর্ণতায় পথে নিয়ে যায়। কোথা থেকে উদ্ভব ও কোথায় শেষ তা বুঝিয়ে দেয়। বিচিত্রতার রূপসাগরে বিলীন করে দেয় গুরুবীজ। ঐ স্বর আমাদের তুলে নেয়। পড়ে যাবার ভয় থাকে না। গুরুবীজ নীচের তল থেকে উপরে তুলে নেয় ও বাইরের থেকে গুটিয়ে নিয়ে আসে। যার মধ্যে আমরা পড়ে আছি তাকে জানতে হলে উর্দ্ধে উঠতে হবে। এটিকে transcendent বলে। এটি "ঐ"-কার অন্ত বীজ। পাতঞ্জলের "অধিমাত্র সংবেগ" হলে তবে আগ্রহের তীব্রতা

বোঝা যাবে। গুরুশিষ্যের পরস্পরের অপেক্ষা রয়েছে। গুরুর করুণাধারা সর্বদাই ঝরছে। শিষ্যের আগ্রহ তীব্র হলেই সে তা বুঝবে। তলবৃত্তি থেকে তখন তিনি শিষ্যকে উর্দ্ধে তুলে নেন। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। জ্ঞানের ধর্ম সসীম থেকে অসীমে নিয়ে যাওয়া। তাই ঐ বীজটি গুরু ও সরস্বতী উভয়েরই দ্যোতক। মূলের সন্ধান দেয় এই বীজ। তিনি বোঝান এই এক থেকেই বিচিত্রতা হয়েছে। মূলে কিন্তু 'একই' রয়েছে। সেই মূলেই আবার সব লয় হয়ে যাবে।

সাধারণতঃ গুরুপূর্ণিমার আগে একাদশী তিথি থেকেই জগৎ প্রভু নিদ্রামগ্ন হন। জীবের মনে সংশয় উপস্থিত হয় যে, ভগবান যখন শয়নমন্দিরে নিদ্রিত তবে আমার ডাকে সাড়া দেবেন কে? কিন্তু ভগবান বলেন— তোমার ভয় কি? গুরুর মধ্যেই আমি পূর্ণভাবে রয়েছি। তাঁর শরণ নাও। পূর্ণিমায় চাঁদের ষোড়শকলা পূর্ণ হয়। ষোড়শকলা পুরুষ পূর্ণভাবে প্রকাশিত হন চন্দ্রের মাধ্যমে। চন্দ্রের জ্যোতিকে পোষণী শক্তি বলে। এ জ্যোতি শান্তি ও পুষ্টি আনে। গুরুও শিষ্যকে পোষণ করেন, তাঁর কৃপায় তাকে স্নিগ্ধ ও পুষ্ট করেন। ভগবান গুরুর মধ্যে সদাসর্বদা জাগ্রত থাকেন। জীববুদ্ধিতে আমরা এই অভেদ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারি না। তাই গুরুপূর্ণিমায় ভগবান শয়ন করে বলছেন গুরুর মধ্যেই আমি পূর্ণভাবে প্রকাশিত। তাই ঃ —

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবোমহেশ্বর।

গুরুঃসাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরুবে নম।।

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদগুরুঃ।

মদাত্মা সর্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

এ শুধু মুখের আবৃত্তি নয়, অন্তরের অন্তরাত্মার সাথে এ তত্ত্বকে মিলিয়ে নিয়েই গুরুর প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া হবে।

আবারও আমরা বলি ঃ—

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।

ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব।।

বিষ্ণু ভগবান চির নিদ্রিত জীবকে ডেকে বলেন, কত আর ঘুমাবে? এবার আমি শয়ন করি, তুমি এবার জাগো। তোমার জাগরণই আমার প্রকৃত আহ্বান।

আমাদের চাওয়া পাওয়ার মধ্যে সর্বদাই একটা ব্যবধান থেকে যায়, তাই আমরা শান্তি পাই না। তাই তিনি পৌর্ণমাসীর রাত্রে বলছেন আজ আমি ষোড়শকলায় তোমার কাছে পূর্ণভাবে আছি। তোমার তো কুবেরের ভাণ্ডার। হে জীব, তুমি কোথায় ঘুরে মরছো? তোমার চাওয়া পাওয়ার পরিসমাপ্তি একমাত্র গুরুপাদপদ্মে। সেই পাদপদ্মে তুমি একান্ত শরণাগতি নাও, তবেই তোমার বিভ্রান্তি থেকে তুমি মুক্তি পাবে। একাদশীর দিন হরির শয়ন হয়। আমরাও এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের পাল্লায় ঘুরে মরছি। দশ ইন্দ্রিয়, তার উপর মন। একাদশীর তাৎপর্য এই যে, এই দশের পাল্লা কাটিয়ে তাঁর দিকে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া। হরির শয়ন থেকে উত্থান পর্যন্ত একাগ্রভাবে গুরুসেবা, গুরুধ্যান,করা একান্ত কর্তব্য। জগন্নাথ ঘুমিয়ে আছেন। তাই কি ঠিক? না-তিনি গুরুরূপে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন। জাগতিক জীবের মনে শ্রীগুরুকে নানা কলায়, নানাভাবে দেখে হয়তো অনেক প্রশ্ন জাগে। কিন্তু আজ তিনি ষোড়শকলায় পরিপূর্ণভাবে, বিশেষরূপে পূর্ণিমার দিন প্রতিভাত হচ্ছেন। এই সময়ে সাধুসন্ন্যাসীরা চাতুর্মাস্য ব্রত করেন। তাঁরা এ সময় এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে শ্রীগুরুর ধ্যান করেন।

গুরুমন্ত্রে বলা হচ্ছে —

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।

চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

আজ এই পূর্ণিমা রজনীতে তুমি পূর্ণভাবে আমার হৃদগগনে উঠেছ, তোমার প্রভায় আমার চোখের মলিনতার গাঢ় অন্ধকার ঘুচে যাক্। তোমায় ভালো করে দেখি। পূর্ণ-রসস্বরূপ, পূর্ণ জ্যোতিঘনরূপ তোমার আজ আমি দু'নয়ন ভরে দেখি। সকল কর্মেই তাঁকে অনুভব করাই তাঁর সার্থক সেবা। গুরু তাই বলছেন প্রতিপদের চাঁদে তুমি আটকে থেকো না। এগিয়ে চলো পরিপূর্ণরূপে তাঁকে আজ দেখতে চেষ্টা করো। এই enjoyment of perfection" ই গুরুপূর্ণিমা। আনন্দের মাধ্যমে আজ সব লয় হয়ে যাচ্ছে। তাঁর প্রতীক্ষায় থাকলে তাঁর কৃপা আসবেই। প্রতীক্ষাই বড় তপস্যা। আগ্রহ অনুগ্রহের সমর্থ সম্মেলন হওয়া চাই। প্রতীক্ষাকে mystic ভাষায় 'অগ্নি' বলে। এই অগ্নি নিজের দিকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে। জীব তাঁকে চাইবে, তাঁকে ভুলে যাবে না তবেই তাঁর লীলা। সরল মনে, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হৃদয়ে তাঁর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতে হবে। তার সঙ্গে কপটতা চলবে না। তবেই তিনি ষোড়শকলায়

পূর্ণভাবে হৃদ্‌গগনে উদিত হবেন।

"শ্রীগুরু" শব্দে পাঁচটি অক্ষর বহুতত্ত্বেরই প্রকাশ করে। যেমন গ্‌+ র্‌+ উ+ উ+ ঃ মিলে 'গুরু ঃ' শব্দ।

এখানে "গ" বলছেন, আমি তো তোর অগতির গতি। "র" অগ্নিবীজ। তিনি বলছেন, ওরে তুই সংসারের জ্বালায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছিস। আমি তোকে তুলে ধরবো। তোর ভেতরের যে আগুন তা জ্বালিয়ে দেব।

একটি "উ" বলছেন, তোর মাঝে যে ভগবৎ তত্ত্ব নির্বীজ হয়ে আছে তাকে আমি উদ্দীপিত করবো। তোর অজ্ঞান উচ্ছেদ করবো। আর একটি "উ" বলছেন, শুধু অজ্ঞান উচ্ছেদ করেই আমি ক্ষান্ত হব না। জ্ঞানের উদয়ও আমিই করবো।

'শ্রী' বলছেন, আরে তুই যে সৌষ্টবহীন হয়ে পড়ে আছিস্‌, আমি তোকে শ্রীমণ্ডিত করবো।

আর সর্বশেষ "বিসর্গ" বলছেন— যা কিছু হলো তার সব সমাপন করে দেব— তোকে নিরঞ্জন করে দেব। যেমন নাকি নদী যতক্ষণ সাগরে যেয়ে মিলিত হতে না পারে, তার চলার অবসান হয় না— সাগরে যেয়ে পড়লেই তার লক্ষ্যস্থলে সে পৌঁছে শান্তভাবে সাগরের বুকে মিশে যায়, সেইভাবে তিনি সব জঞ্জাল দূর করে পরাকাষ্ঠায় নিয়ে যান। জাহাজের Compass —এর মতো ঠিক পথে টেনে নিয়ে যান।

কাজেই শ্রীগুরুর শরণাগতি ছাড়া জীবের উদ্ধারের পথ নেই। শ্রীগুরু ও ইষ্ট অভিন্ন— এই জ্ঞান বদ্ধমূলভাবে হৃদয়ে পোষণ করাবার জন্যই গুরুপূর্ণিমার উৎসব।

এই শুভদিনে শ্রীগুরুর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন ধ্যানে জ্ঞানে সর্বদাই জীবের হৃদিমন্দিরে অবস্থান করেন।

আনন্দ বার্ত্তা বর্ষ ৩৪, জুলাই ১৯৮৭ সংখ্যা

মাতৃবাণী

(মা নিজে লেখেন না। পত্র পাঠককে উত্তর বলে দেন। আমাকে তিনি মাতৃবাণী লিখে দেন। সেই মাতৃবাণী কয়েকটি উল্লেখ করা হল)

সদগ্রন্থ মহাপুরুষের জীবনী ইত্যাদি পড়লে লাভবান হয় মঙ্গল হয়। কেউ ভাবে নানারূপের নিজে ইষ্ট গুরু আছে। বিশেষ দিনে ভাগেভাগে ভোগ দেয়। তাতেও কারো ভাল আবার ইষ্ট গুরুর মধ্যে সব আছে ভাবনা করেও দেয়। তোমার যেটি অনুকূল হয় তাই অনুকূল ক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় মনটা লাগান।

দিল্লী ২২/৮/৯৯ চিত্রা

বিজয়ায় নিজেকে জয়যুক্ত হওয়া এইতো মানুষের চাওয়া।

বেনারস ২৮/১০/৫৯ গুরুপ্রিয়া

বিপদভঞ্জন শ্রীমধুসূদন সর্ব্বাবস্থায় তাহাকেই স্মরণীয়।

নিউদিল্লী ৩০/২/৫৯ পরমানন্দ

সর্বক্ষণ পরমার্থ পথে তাঁহার চরণ স্মরণে জীবনযাত্রা সফল রাখার চেষ্টা।

কিষেণপুর ২৫/৪/৬০ গুরুপ্রিয়া

যদি হৃদ্যতার সহিত মিলেমিশে কাজ না হয় তবে যে উপায়ের পূর্ণতায় মনতুষ্টি হয় তাহারই চেষ্টা করণীয় নয় কী? তিনি যা করেন মঙ্গল মনে রাখতে হয়। বিক্ষিপ্ত জগতের কার্য্যে ব্যাকুলতার স্থান দিতে নাই।

পিতামাতার ইচ্ছা সহজভাবে ছেলের কোন দিকে সে সব বুঝে ব্যবস্থা করা।

বৃন্দাবন ৫/১/৬১ চিত্রা ঘোষ

কোন দেবতা, বীজমন্ত্র কোন সময় কীভাবে পেয়েছে খুলে জানানো। চিঠিতে বীজমন্ত্র লেখার দরকার নাই। ছোটবেলা থেকে যে ভাবে দেখে এসেছে সে ভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা রেখে প্রাণ দিয়ে উপধ্যান করা।"

হোসিয়ারপুর ১৩/৩/৬১ চিত্রা

ও সব ভাবতে নেই জপধ্যানে মন দেওয়া তাতেই কল্যাণের দিক, শান্তির দিক।

নিউ দিল্লী ৫/১০/৬১ চিত্রা

নিজের জীবন সর্ব্বস্ব মহা বিজয়ারূপ ধারণ করে ইহাই মানুষের প্রার্থনীয়।

দেরাদুন ৪/১১/৬১

জপ ধ্যান ভগবৎ ক্রিয়াই মানুষের করণীয়। গোপালের সেবায় কল্যাণের পথে সতেজে যাত্রা হওয়া, বন্ধুকেবলা বন্ধুর কথা এই— ভগবানের নামকরা তাঁর ধ্যান করা ও নমস্কার করা নিত্য। সকলে কেমন আছে।

বৃন্দাবন ৫/১/৬৩ পুষ্প

আনন্দের কথা, সাধুমন্ত সেবা, কর্ত্তব্যপালন, ধর্মের সংসারই মানুষের কর্ত্তব্য সর্বদা সত্যানুসন্ধানই কর্ত্তব্য।

দেরাদুন ১/৮/৬২ চিত্রা

পরম পথের যাত্রীর দ্রুত চলার চেষ্টা করা।

দেরাদুন১৪/৫/৬২ গুরুপ্রিয়া

অষ্টধাতুর ঐরূপ মূর্তি যদি পাওয়া যায় দেখা যাক কি হয়, ভগ্ন বিগ্রহের জলপ্রবাহ দেওয়াই তো শাস্ত্রীয় বিধি। ভগ্নবিগ্রহের পূজা হয় না। ভালো দিন দেখে জলপ্রবাহ দিয়ে দেওয়া।

দেরাদুন ৫/৭/৬২

ভাগবতপাঠ খুব ভাল কথা— সব সময় ভগবানের কথা নিয়ে মানুষেরই থাকা যা শান্তির ও আনন্দের দিক।

রাঁচী ১৭/১/৬৩ স্বামীপরমানন্দ

স্থানমাহাত্ম্যে মহাত্মার কৃপায় আরোগ্য ভাল কথা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হয় তিনি যাহা যেভাবে করাবেন তাহাই। পরমার্থ চিন্তায় মন দেওয়া।

দেরাদুন ১৫/৭/৬৩ চিত্রা

মায়ের ক্রিয়া সংস্থানে ভালো ভাবে অনুভব আনন্দ। বাবা, মা, বন্ধুরা সব ভালো তো? সর্বাবস্থায় তাহাকেই স্মরণীয়।

দেরাদুন ২৮/৬/৬২ চিত্রা

ইষ্টের মধ্যেই সব রয়েছে মনে দ্বিধা থাকলে ঠিক হবে না কাছে এসে সুমীমাংসা করে নিও।

বৃন্দাবন ২১/১/৬২ চিত্রা

স্বয়ং ভগবান সকলের গুরু সব সময় তার উপর ভরসা রাখা। সর্বাবস্থায় তাঁকেই স্মরণীয়।

কিষেণপুর ৬/৮/৬৩ চিত্রা

স্বপ্ন অলীক বলে বাঞ্ছিত কথা ও ভাব জাগতিক রাজ্যে দেখা যায়— যেগুলি ভাল বলিয়া মনে হয়, মনে প্রসন্নতা রাখা। সব বিষয়েই ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করা।

রায়পুর ১৮/৯/৬৩ চিত্রা

তীর্থযাত্রা ঠাকুর দর্শনই তো আনন্দ হওয়া, ঠাকুর নিয়েই থাকার চেষ্টা করা মানুষেরই।

থড়থড়ি হাউস ১৯/২/৬৩ চিত্রা

পশুপতিনাথ দর্শন আনন্দের কথা। জন্মদিবস সফল হওয়ার দিক হয় ভগবৎ প্রাপ্তির দিকে যাহার যাত্রা।

হরিদ্বার ১২/৩/৬৪ স্বামীপরমানন্দ

স্বপ্ন ঠিকই শরীর ঠিক নাই। যেখানেই থাকা ভগবানকে নিয়ে তাঁহার স্মরণ অনুকূলে।

হরিদ্বার ১৩/৯/৬৪ নির্ব্বানানন্দ

পরমার্থের দিকে চলে— সত্যানুসন্ধানে সুস্থ সন্ত হওয়া মানুষেরই।

আলমোড়া ২৮/৪/৬৪ স্বামীপরমানন্দ

মানুষেরই ভগবৎ প্রাপ্তি ইচ্ছা হইলে ভগবান লাভ। সর্বদাই সত্যানুসন্ধান ক্রিয়াটি পূর্ণ হয় মানুষেরই কেবল চেষ্টা।

কিষেণপুর ২৯/৭/৬৪ স্বামীপরমানন্দ

যথা শক্তি বসিয়া ধ্যান ভজনে মন রাখা— যেভাবে ভগবানে মন লাগে তাই করা। বন্ধুর সব ঠিকমতন খুব ভাল কথা। সকলেরই ভগবান মন রাখা। ভগবানকে লাভ মানুষেরই কর্ত্তব্য।

রাঁচী ৪/৩/৬৫ দিদি গুরুপ্রিয়া

সব সময় ভগবানের উপর ভরসা রাখা, যদিও ইহা মনে রাখা সব সময় সম্ভব নয় তবুও সর্বক্ষণ, সর্বাবস্থায় ভগবানকে স্মরণ।

রাঁচী ৩০/৫/৬৫ চিত্রা

জগন্নাথ যা করান তাই করা। জগন্নাথের উপর নির্ভর রাখা।

রাঁচী ১৪/৬/৬৫ চিত্রা

ভগবৎ স্মরণ মানুষেরই সর্বক্ষণ হওয়া। সেবায় চিত্তশুদ্ধ হওয়া।

আলমোড়া ১১/৬ ছবি

যোগাযোগ যা হয়ে যায়, ভগবৎ ধ্যান ভজন নিয়ে সুস্থমনে থাকতে চেষ্টা করা।

বেনারস ১২/৮ চিত্রা

সব সময় ভগবানের স্মরণ মানুষের উদ্দেশ্য হওয়া। নিজ কর্ত্তব্য করা ত্রুটি না হয়।

ভগবান যা করান তাই করা। সব অবস্থায়ই ভগবানের উপর নির্ভর রাখা।

বম্বে ৬/১২/৬৫ গুরুপ্রিয়া

ভগবান যা করান তাই করা। ভগবানের উপর সব সময় ভরসা রাখা। যোগাযোগ হইলে দেখা হওয়া।

আনন্দকাশী ২২/৩/৬৬ স্বামীপরমানন্দ

মহা বিজয় লক্ষ্যে মনুষ্য জীবন পরম পথের যাত্রী হওয়া।

বৃন্দাবন ৩০/১০/৬৬ দিদি গুরুপ্রিয়া

যেখানে থাক ভগবৎ স্মরণ নিয়ে থাকো। ভগবান যা করান করা। তিনি যা করেন মঙ্গলের জন্যই তো।

বৃন্দাবন ১০/২/৬৭ বিরজানন্দ

ঠাকুর সেবা সদগ্রন্থপাঠ স্মরণ মনন, ভগবান চিন্তার অনুকূলে থাকতে পারলেই মঙ্গল কল্যানের দিক।

বৃন্দাবন ২৬/৭/৬৭ চিত্রা

সহজভাবে জপ যতবার হয় হোক বুকের কষ্ট যেন না হয়। কোমড়ে ব্যথা হলে শুয়ে বা ঠেসা দিয়ে বসে জপধ্যান করবে। সৎগ্রন্থাদি পাঠ ও পূজায় সৎসঙ্গে মনটা ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা।

বৃন্দাবন ২৬/১১/৬৭ চিত্রা

ভগবান যা করেন করান তাই হয়। সব সময় ভগবানের উপর নির্ভর ভগবানকে প্রার্থনা করণীয়।

বেনারস ১০/২/৬৮ চিত্রা

ভগবান যা করান তাই হয় মনে রাখা, সব সময় নির্ভর মনে জপ, হাতে কাজ সর্বাবস্থায় স্মরণ।

বৃন্দাবন ৭/৩/৬৮ চিত্রা

সব বিষয়েই ভগবান যেখানে যাহা করেন। ভগবানকেই স্মরণ নির্ভর।

কনখল ৫/৩/৬৮ চিত্রা

নতুন বছরে নিত্য নূতন ভাব জাগরণ হওয়া কর্ত্তব্য।

দেরাদুন ১৮/৪/৭১ নির্ব্বানানন্দ

চিঠি দাও। ভগবান যা করান। তাঁহাকে স্মরণ জপধ্যানে মন রাখা।

পুণা ১৯/৮/৭২ বিম্লোজী

ভগবানের কৃপা প্রার্থনায় সব সময় ব্রতী থাকার চেষ্টা শ্রদ্ধা ভক্তির অনুকূলে। যে অবস্থায়ই থাকা নিজ কর্ত্তব্য পালন। ভগবান যখন যোগাযোগ করেন দেখা।

পুণা ১৬/২/৭৩ নির্ব্বানানন্দ

মার নববর্ষের বাণী "নিজ লক্ষ্য প্রাপ্তির জন্য মানুষের মহাযাত্রা হওয়া, নিত্য নব নব ভগবৎ অনুভূতি স্থিতি লাভের দিকে ব্রতী থাকা।"

নৈমিষারণ্য ২৭/৪/৭৩ চিত্রা

ভগবানের রাজ্যে সবই বিধান। ভগবান যা করেন করান তাহাই করা প্রাণের সব নিবেদন আবেদন ভগবানকে জানানো।

নৈমিষারণ্য ৩/১০/৭৫ পরমানন্দ

পিতামাতার সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালন। ঋষি পন্থায় গৃহাশ্রমে প্রবেশ— ধর্মের সংসার হওয়া।

ভীমপুরা ৯/১১/৭৭ পুষ্প

নিত্যপূজা যারা করে তাদের তো কোন কথাই নাই। বিশেষ দিনে ও তো শিবপূজো করাই। শিবপূজো করার কোনো বাধা নাই। ভগবান স্মরণ।

অজ্ঞাতবাস— ১৯/৩/৭৯ ইতি

ভগবানের চরণ সর্বক্ষণ স্মরণ। লক্ষ্য পরিবেশে মনরাখা।

বৃন্দাবন ৩/৮/৭৯ পরমানন্দ

সব পরিস্থিতিতে ভগবৎ স্মরণ। গোপালের যা ইচ্ছা।

বৃন্দাবন ১৬/৮/৭৯ নির্ব্বানানান্দ

তোমার চিঠিতে সকলের আনন্দের খবর। গোপাল যা করেন— করান। নিজ কর্ত্তব্যের ত্রুটি না হয়। সর্বদা ভগবানকেই স্মরণ। প্রাণের গোপাল প্রাণেই। সর্বদা সকলের সুস্থ খবর দেওয়া। বাবার শরীর সুস্থ রাখার চেষ্টা। সর্বপরিস্থিতিতে ভগবান স্মরণ।

বৃন্দাবন ২১/৮/৭৯ নির্ব্বানানন্দ

ভগবান যা করান করা। সর্বদা ভগবৎস্মরণ। তাঁর কাছেই প্রার্থনা।

দেরাদুন ১৩/৬/৮০ নির্ব্বানানন্দ

মায়ের নববর্ষের বাণী ঃ

ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় হওয়ার চেষ্টা। ত্রুটিহীন নিজ কর্ত্তব্য পালন।

কনখল ২৪/৪/৮১ স্বামী পরমানন্দ